প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর—কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা

খালেদ চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দাম দু টাকা

আমাদের প্রাণেশ্বর পণ্ডিত শ্রীরামনাথ দেবশর্মার (এম, এ এবং কাব্য-বিষারদ, বেদান্তবাগীশ জ্যোতিষার্ণব ইত্যাদি অনেকগুলি দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত উপাধি) একমাত্র পুত্র।

পর পর তিনটি কন্যা। তারপর প্রাণেশ্বর।

তারপর রামনাথের আরও তিনটি কন্যা জন্মেছে।

প্রাণেশ্বরকে জন্ম নিতে হয় কলকাতার শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে, মা হওয়ার মুস্কিল সামলাবার ওয়ার্ডে। মাকে তিনদিন তিন রাত্রি ভুগিয়ে প্রায় মেরে ফেলে আমাদের উপাখ্যানের শ্রীমান রাত একটা নাগাদ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।

সরলার জ্ঞান ছিল না। অজ্ঞান অবস্থাতেই সরলাকে প্রসবাগার থেকে আনা হয়েছিল তার বেডে।

বাচ্চাকেও অর্থাৎ আমাদের নবজাত প্রাণেশ্বরকেও রাখা হয়েছিল যথাস্থানে।

সরলার জ্ঞান আছে কি নেই এটা কেউ খেয়াল করে নি। খেয়াল করাটা দরকার মনে করে নি।

মাঝ রাত্রে ছেলেকে জন্ম দিয়ে শেষ রাত্রে সরলার জ্ঞান ফিরে আসার সময় একজন নার্সও কাছে ছিল না।

দোষটা ব্যবস্থার, নার্স কিম্বা অন্যদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। হলই বা নার্স, বাদই নয় গেল আরাম বিলাসের কথা, না খেয়ে না ঘুমিয়ে বিশ্রাম না পেয়ে তারাই বা কেমন করে বাঁচে?

সরলা পর পর কয়েক মিনিটের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার একদিন আগে থেকেই। নইলে কি আর তার হাসপাতালে আসার ভাগ্য হয়!

জ্ঞান ফিরে আসতে সুরু করলে প্রথম কথাই তার খেয়াল হয়েছিল যে বিয়ানো বাচ্চাটা কাঁদছে না, নড়ছে না!

সরলার উঠবার ক্ষমতা ছিল না।

কি করা যায়?

প্রথমে বালিশটা তারপর জলের গেলাসটা সরলা ছুঁড়ে মেরেছিল পাশের বেডের ঘুমন্ত মণিমালার গায়ে।

মণিমালাও হাসপাতালে এসেছিল সন্তানকে জন্ম দিতে—প্রথম সন্তানকে। বয়সে অনেক ছোট, খুব স্মার্ট একেলে মেয়ে, তবু তার সঙ্গেই বেশী হৃদ্যতা জন্মেছিল সরলার।

এপাশের বেডেও এক সমবয়সী এবং প্রায় তারই মত সেকেলে চার সন্তানের মাটিকে তার তেমন পছন্দ হয় নি।

মুখে শুধু নিজের দুঃখ দুর্দ্দশার গাউনি। এত মা আর হবু-মার মধ্যে একমাত্র তারই যেন মন্দ কপাল।

সরলা ভর্তি হবার দু'দিন আগে মণিমালার একটি মেয়ে হয়েছিল। যতই স্মার্ট আর একেলে মেয়ে হোক, প্রথম কচি মেয়েকে নিয়ে কী বিব্রতই সে হয়েছিল, জগৎ-জোড়া জীবনের খেলা চালিয়ে যাবার কাণ্ড কারখানায় আনাড়ি অবুঝ খেলোয়াড়নীর মত হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অল্প অল্প প্রসব বেদনা নিয়ে তিন দিন তিন রাত্রি সরলা তাকে বুঝিয়েছিল দেখিয়েছিল হাতেনাতে শিখিয়েছিল কি ভাবে বাচ্চা সামলাতে হয়।

নিজের সম্পর্কে আতঙ্ক জন্মেছিল। এমন ব্যাপার তার জীবনকালে কখনো আর ঘটে নি।

ঘর সংসারের কাজ করতে করতে ব্যথা উঠেছে, দু'চার ঘণ্টার মধ্যে মেয়ে প্রসব করেছে। একবার নয়—তিনবার। এবার কি অদ্ভুত কাণ্ড হল কে জানে!

জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাই সরলা বুঝেছিল তার বাচ্চাটার প্রাণ বাঁচাতে মণিমালা ছাড়া আর কারো কাছে ধন্না দিয়ে লাভ নেই। যত বড়

হাসপাতাল হোক আর যত বিরাট সমারোহমূলক ব্যবস্থা থাক—কৃতজ্ঞতার খাতিরে মণিমালাই তার বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারবে।

হাসপাতালের বিরক্ত বিব্রত এবং নানা ঝন্‌ঝাটে জর্জরিত ডাক্তার নার্সদের সাহায্যের জন্য হাউমাউ করে কান্না জুড়লে কোন লাভ হবে না।

প্রথমে সরলা তাকে ডাকে। তারপর বালিশটা ছুঁড়ে মারে।

তারপর ছুঁড়ে মারে কাঁচের গেলাসটা।

গেলাসটা মাথায় লেগেছিল মণিমালার। মাথায় সীঁথির কাছে একটু কেটে গিয়ে রক্ত বার হয়েছিল। কিন্তু কালো চুলের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাজা লাল রক্ত—সরলা বহুদিন জানতেও পারে নি যে গেলাস ছুঁড়ে মেরে সে মণিমালার মাথায় রক্তপাত ঘটিয়েছিল নবজাত প্রাণেশ্বরের প্রাণরক্ষার জন্য।

জেগে উঠে ব্যাপার জেনে বুঝেই মণিমালা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে প্রাণেশ্বরকে কাঁদাবার এবং নড়াচড়া করবার সমস্ত অনভ্যস্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়ে ছুটে গিয়ে ডেকে এনেছিল ঘুমন্ত ডাক্তার গোস্বামীকে।

প্রাণেশ্বরের কচি গা ফুঁড়ে প্যাঁট করে একটা ইনজেকসন দিয়ে ডাক্তার গোস্বামী মণিমালাকে বলেছিল, দেরী হয়ে গেছে। কে জানে কি হয়!

সঙ্গে সঙ্গে সরলা ক্ষীণস্বরে কেঁদে ওঠায় ডাক্তার ও মণিমালা দুজনেই বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

তিনদিন তিন রাত্রিতে কতবার জ্ঞান হারিয়েছে ঠিক নেই। তাকে বাঁচাতে পেটের বাচ্চাটাকে কেটে কুটে বাইরে আনা উচিত হবে কিনা সে কথাও গোস্বামীকে বিবেচনা করতে হয়েছিল। সেই মানুষটা তাদের কথা জানাই বিয়ানো বাচ্চাটা মরে যাবে শুনে ক্ষীণস্বরে কাঁদছে!

মণিমালা বুঝতে পারে মেয়েদের প্রাণশক্তি যতটুকুই অবশিষ্ট থাক, দরকার হলে মায়ার টানে সেটুকুও বোমার চেয়ে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

তার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা যাতে হয়, চরম চেষ্টা যাতে হয়, এই উদ্দেশ্যেই তার সমস্ত প্রাণশক্তি কেন্দ্রীভূত করে কাঁদা।

ঘনিয়ে আসা নিজের মরণ অগ্রাহ্য করে, ঘনিষ্ঠ মৃত্যুর নেশায় বিভোর আচ্ছন্ন হয়ে থাকার আরাম ছেড়ে সমস্তটুকু প্রাণশক্তি খরচ করে তার একমাত্র উপায় কান্নাকে অবলম্বন করেছে।

বাঁচা-মরাকে ছাড়িয়ে তোলা, দেহ মনের অণুতে অণুতে জমিয়ে তোলা যে সন্তানের মায়া গেলাস ছুঁড়ে মাথা চিড়ে মণিমালাকে জাগিয়ে দেবার প্রেরণা জাগিয়েছিল, সেই মায়াই তাকে কাঁদাতে পেরেছে। নইলে দুর্বলতা, ব্যথা আর ওষুধের প্রক্রিয়ায় চেতনা যার স্তম্ভিত হয়ে যাবার কথা সে কখনো এমন সচেতনভাবে কাঁদে!

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তার বিচারই ঠিক। সরলার কান্নায় বিচলিত হয়ে ডাক্তার গোস্বামী আরেকজন সহকর্মীকে ডেকে তুলে নিয়ে আসে।

সে না এলে প্রাণেশ্বরের প্রাণ ঘণ্টাখানেক টিঁকত কিনা সন্দেহ।

মণিমালা তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেছিল, আপনার ছেলে হয়েছে। আমরা আছি, ভয় কি?

কয়েক মিনিট পরেই প্রাণেশ্বর ওঁয়াও ওঁয়াও করে কেঁদে উঠেছিল।

সে কান্না শুনে জীবন যেন ফিরে পেয়েছিল সরলা।

তিন দিন তিন রাত্রির আধা-চেতন আধা-অচেতন অবস্থাতেই সে টের পেয়েছে চার জন আশে পাশে মা হতে মরেছে।

সে তবে বাঁচলো!

তিন মেয়ের পর একটা ছেলের মা হলো!

ছেলে তার বাঁচবে জেনেই জ্ঞান হারিয়েছিল। তখন লড়াই করতে হয়েছিল তাকে বাঁচানোর জন্য।

হাসপাতালে কোন মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা—লড়াই!

এটাও সম্ভব হয়েছিল মণিমালার জন্য।

অনেক ভেবে চিন্তে সে একটা হৈ চৈ কাণ্ড জুড়ে দিয়েছিল। এরকম কাণ্ড করার ফলে নিজের অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে সেটা কল্পনা করেও সে কিন্তু কিছুমাত্র ভয় পায় নি।

মেয়েকে মাই দেওয়া মণিমালার নিষিদ্ধ ছিল। মাথা ঘুরছিল তবু নিষেধ অমান্য করে উঠে বসে, ভবিষ্যতে কখন কিভাবে মেয়েকে মাই দিতে হবে সে বিষয়ে সরলার উপদেশ স্মরণ করে এবং মেয়েটাকে কোলে নিয়ে তার মুখে মাই গুঁজে দিতে তৈরী হয়ে সে অপেক্ষা করে ডাঃ গোস্বামীর দায় সারতে হাসপাতালে বৈকালিক পাক দিতে আসার জন্য।

ডাক্তার গোস্বামী হন হন করে ওয়ার্ডে ঢুকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতেই মাইটা ঘুমন্ত কিন্তু জীবন্ত মেয়েটার মুখে গুঁজে দিয়ে বলেছিল, ডাক্তারবাবু, আপনাদের সময় নেই, খুব বেশী খাটেন। খাটুনি বাড়াতে বলার সাহস নেই। আমাকে আর আমার বাচ্চাকে বরং মরতে দিন, সরলাদিকে খেটেখুটে বাঁচান। সরলাদি যদি মরে—

: সরলাদি যদি মরে তুমিও মরবে নাকি স্যুইসাইড করে ?

: মরব কেন ? আপনাদের মারব। ছেলে মেয়ে বিয়ানো কি ইয়ার্কির ব্যাপার ? আপনারা পুরুষ ডাক্তাররা বুঝবেন না।

ঘুমন্ত মেয়েকে মাই থেকে খসিয়ে যথাস্থানে রেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, সরলাদি মরবেই কেন ?

: কে বলেছে মরবেই ? এত উতলা হয়েছ কেন তুমি ? মানুষকে বাঁচানোই আমাদের পেশা। তবে কিনা, নিজেরা না বাঁচলে মানুষকে বাঁচানোর পেশা চালাবো কি করে ?

কয়েকদিন পরেই সরলা ছেলেকে বুকে নিয়ে মাই দিতে দিতে ওয়ার্ডের হবু-মা আর সত্য সত্য মা-হওয়া মানুষদের বেডগুলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে সুরু করেছিল, এ-কে দিচ্ছিল উপদেশ আর ও-কে দিচ্ছিল পরামর্শ—সে-ই যেন চার্জ পেয়েছে মানুষ জন্মাতে গিয়ে বিপদে পড়া জন্মানো মানুষগুলির।

তখন কথায় কথায় মণিমালা তাকে জানিয়েছিল, আমার মা এখানেই মারা গিয়েছিল—বছর দুই আগে। আপনার বাচ্চাটা খানিক যন্ত্রণা দিয়েই রেহাই দিয়েছে—আমার রাক্ষস ভাইটা মাকে খেয়ে ছেড়েছিল।

: অমন করে বলতে নেই। পেটের বাচ্চারা কেন বাছা আরও বড় ছোট শিশুদেরও কি কোন বিষয়ে কোন দোষ ঘাট হতে পারে?

: কথার কথা বলেছি—ওকে জন্ম দিতেই তো মাকে মরতে হল। আমার পর মার আর ছেলেপুলে হয় নি, উনিশ কুড়ি বছর বয়সে আমার বিয়ে হল—তারপর রাক্ষসটা মার পেটে এল। পূজোর সময় কদিনের জন্য শ্বশুর বাড়ী থেকে এলাম—

মণিমালার গলা জড়িয়ে গিয়ে তু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়েছিল।

বড় পণ্ডিতের স্ত্রী, সন্তানের জননী আর মস্ত সংসারের দায়-বওয়া পাকা গিন্নি সরলার চোখেও জল ছল ছল করেছিল।

: কী আনন্দই হয়েছিল। সারাদিন মাকে জড়িয়ে ধরতাম আর বলতাম—আমাকে বিদেয় করে বুঝি আরেকটা মেয়ে দরকার হয়েছে? এবার মেয়ে পাবে না···বলে যাচ্ছি দেখো, এবার আমার ভাই হবে। জানেন, ছ'সাত মাস আমায় জানায় নি। এবার এসে শুনলাম।

অনেকক্ষণ পরে সরলা জিজ্ঞাসা করেছিল, এই হাসপাতালে আসতে তোমার ভয় হয় নি?

মণিমালা বলেছিল, হয় নি? বাবা ধমকে দিলেন। মা'র বেলা নাকি কারো কিছু করবার ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না—করা যেত নিশ্চয়, ব্যবস্থা ছিল না। বাবা বুঝিয়ে বললেন যে আমার সিম্পল কেস, কোন গোলমাল নেই—এখান থেকে শুধু হাঙ্গামাটা চুকিয়ে যাব। বাবার কথা ভেবেই মনটা শক্ত করে চলে এলাম। বাড়ীতে একজন মেয়েছেলে নেই—সামলাতে বাবার প্রাণ বেরিয়ে যেত। কীরকম বিশ্রী যে লাগছিল!

সরলা জিজ্ঞাসা করেছিল, বাড়ীতে একটা মেয়েলোক নেই, সন্তান বিয়োতে তুমি বাপের বাড়ী এলে কেন বাছা? তোমার শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা নাকি খুব ভালো, সায়েবসুবোরা আসে যায় খানাপিনা করে? কলকাতার মত না হোক, দিল্লীও তো কম বড় সহর নয়। ওখানে তোমার বিয়োনোর ব্যবস্থা ওরা করতে পারল না?

: না। ঝনঝাট এড়িয়ে গেল।

: তুমি এসে বুঝি শুনলে মা মারা গেছে?

: হ্যাঁ। মার কাছেই আমায় পাঠিয়েছিল।

: ওরাও জানত না মা মারা গেছে?

: জানত বৈকি। বাবা টেলিগ্রাম করেছিল, তিনচার খানা চিঠি লিখেছিল। সব ওরা গাপ করে দিয়েছিল।

মণিমালার স্বামী শ্বশুর দেওর ভাসুর বাপ দাদার নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে সরলা কসুর করে নি। কোন একটা মেয়ের এসবই তো আসল পরিচয়—তার নিজের তো কোন পরিচয় নেই।

ভেজাল মেশানো রক্তের মত লালিম একখণ্ড সাদা মাখনে নিখুঁত গড়া পুতুলের মত পাশে ঘুমোচ্ছে মণিমালার কচি মেয়েটা।

অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে সরলা জিজ্ঞাসা করেছিল, সমর কিছু বলে নি? আপত্তিও করে নি?

: ও-ই তো তোড়জোর করে আমায় পাঠিয়ে দিল। ওই-তো একরকম আপিস চালায়—সংসার চালায়।

মণিমালার স্বামী সমরের বাবা তার কাকা দুজনেই একপুরুষে দিল্লীতে স্থায়ী চাকুরে।

সমর বিদ্যালাভ করেছে প্রধানত কিছুদিন কলকাতায় এবং আরও অল্প কিছুদিন বিলাতে। আগে বিলাত-ফেরত বললেই দেশে বিদেশে এক ধরণের শিক্ষা পাওয়া মানুষদের বোঝাত—উদ্দেশ্য গুলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে শিক্ষাও আজ কিভাবে গুলিয়ে গেছে!

তবু দিল্লীতে সমরের অস্থায়ী কাজটা আরও কয়েক বছরের জন্য স্থায়ী করার ব্যবস্থা হয়েছিল—সমর চেয়েছিল চিরস্থায়ী কাজ।

বাপখুড়োর সঙ্গে সমান ভাবে পাল্লা দিয়েও বিশেষ কৃতিত্ব দেখানো যায় এমন কাজ।

এ অবস্থায় ওরকম কাজ ফরমাস দিয়ে তৈরী করা থাকে না। অগত্যা বেশী বাড়াবাড়ি করায় একটা অস্থায়ী লাগসই কাজ সৃষ্টি করে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কলকাতায়—একবছর কি দেড়বছর পরে কাজটা একেবারে খতম হয়ে যাবে। সে শুধু কর্তাদের কাছে চিঠি লিখে মামুলি জবাব পাবে।

মাসে মাসে তাকে মাইনে দেওয়া কাজের ব্যবস্থা করার দায় কারো ঘাড়ে নিতে হবে না।

মেয়েকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার তিন দিন পরে লেখা মনিমালার চিঠি পড়ে একমাস চুপচাপ থেকে সমর জবাব লিখেছিল: অনেক ভেবে চিন্তে আমি কলকাতায় গিয়ে কলকাতায় থাকাই ঠিক করলাম। মেয়েটা কেমন হয়েছে? তেমন বিশ্রীরকম হলে আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দিও। ছেলে মেয়ের সাধ আমার মোটেই নেই—ঝঞ্ঝাট না বাড়ানই ভাল!

কলকাতায় এসে তিনমাস পরেই সমর চাকরিতে ইস্তাফা দেয়।

চাকরি থাকবে না জানাই ছিল।

সুতরাং অনর্থক কলহ করে লাভ কি?

মণিমালার ঠিকানা নেওয়াই ছিল।

প্রাণেশ্বরের ঘাড় শক্ত হতেই সরলা তাকে বুকে নিয়ে তাদের বাড়ী যাতায়াত সুরু করে।

প্রথমদিন গিয়ে ছেলেকে মণিমালার কোলে তুলে দিতে দিতে বলে, যা, আসল মায়ের কাছে যা। আমি তো শুধু বিইয়েছিলাম, এই মা তোর প্রাণ বাঁচিয়েছে।

বলে মণিমালার মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয়।

মণিমালা বলে, ইস্, সে কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। আপনার জ্ঞান হতে যদি দেরী হত, গেলাস ছুঁড়ে মেরে আমায় জাগাবার বুদ্ধি যদি মাথায় না আসত······মাগো! ডাক্তার বলছিলেন দশ পনের মিনিট এদিক ওদিক হলে ফাঁড়া কাটত না।

সরলা বলে, আর বলো কেন, এই রাক্ষসটাকে বিয়োতে আমারও আদ্দেক প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। বিয়োতে এত হাঙ্গামা হয়, এটার বেলায় প্রথম টের পেলাম। হ্যাঁ, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। গেলাস ছুঁড়ে তো মারলাম, তুমি চীৎকার করে ধড়মড়িয়ে উঠেছিলে। খুব লেগেছিল নিশ্চয় ?

একটু হেসে মণিমালা বলে, মাথা কেটে রক্ত বেরিয়েছিল। মেয়ে সামলাতে প্রাণ যায়, অতটা খেয়াল করি নি। ঘা-টা একেবারে সেপ্টিক হয়ে গিয়েছিল। মাথা ন্যাড়া করতে হয়েছে।

: তাই চুলের এ দশা !

: কি করি, বব্ করে মেম সেজেছি। ছোট একটা টাক পড়েছে— দেখবেন ?

চুল সরিয়ে মণিমালা তাকে ক্ষতচিহ্নটা দেখায়।

সরলার মুখের ভাব দেখে বলে, না না, দুঃখ করবেন না। একটু কেটেছে, একটা দাগ হয়েছে—তাতে কি ? ওতো চুলে ঢাকাই থাকবে। সত্যি কথা বলব শুনবেন ? ন্যাড়া হবার সময় কান্না পাচ্ছিল, রাগ হচ্ছিল আপনার ওপর। কী চুল ছিল আমার, অনেকে হিংসা করত। আপনি তো দেখেইছেন। ন্যাড়া হবার পর কিন্তু আস্তে আস্তে ভারি আরাম লাগতে লাগল। আয়নায় মুখ দেখলে মনটা খানিকক্ষণ বিগড়ে যেত কিন্তু তারপরেই ভারি স্বস্তি লাগত।

মণিমালা একটু হাসে। সহজ শান্ত হাসি।

: মোটা গোছের লম্বা চুল থাকার সোজা ঝন্ঝাট ? একটা বোঝা থেকে যেন রেহাই পেয়েছি।

: ক'মাসে এত বড় হয়েছে ? তোমার চুলের বাড় আছে। দেখতে দেখতে আগের মত হয়ে যাবে। আগের চেয়ে ভালই হয় তো হবে, ন্যাড়া হলে চুল বাড়ে।

: চুল আর আমার বাড়বে না। আমি বাড়তে দিলে তো বাড়বে ! আমার দরকার নেই একগাদা চুলের, মস্ত খোঁপার। অন্যদের মনে হিংসা

জাগাবার সুখ দিয়েও আমার দরকার নেই। মাগো মা, চুল নিয়ে কী হাঙ্গামা—শুধু তেলের কি খরচ চুলের পেছনে! ব্যাটাছেলেরা আমাদের এমনি সব হাঙ্গামায় মাতিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায়।

: ব্যাটাছেলেদের ওপর তোমায় দেখি বড় রাগ ?

: রাগ নয়। আমরাই তো বোকার মত এসব সস্তা মন-যোগানো ঝন্‌ঝাট মেনে নিয়েছি। নিজেরা ছোট করে চুল ছাঁটবেন, নেয়ে এসে এক মিনিটে টেরি কেটে আমাদের এতক্ষণের রান্না দু'চার মিনিটে গিলে কাজে যাবেন। আপনিই বলুন না, চুলে যদি রূপ বাড়ে, ওনারা কেন লম্বা চুল রাখেন না ?

: ব্যাটাছেলের যে রূপের দরকার নেই বাছা। ব্যাটাছেলের মাপকাটি হল গুণের—কাজের ক্ষেমতার। রূপ দরকার মেয়েদের—রূপেই তো সে ভোলাবে ব্যাটাছেলেদের ? তার রক্ত জল করা পয়সায় ভাগীদার হবে ?

: আপনি এত বোঝেন ?

: আহা, তোমার কাছে এই নাকি এত বোঝা ? এ তো সাদামাটা সিধে কথা—সবাই জানে—ব্যাটাছেলে রোজগার করে আমরা সেই রোজগার দিয়ে সংসার চালাই। ব্যাটাছেলের সংসারটাই অবশ্য চালাই। কিন্তু বাছা আসল কথা বুঝলে না তুমি। আমাদের জোরটা কোথায় ? আমাদের বাদ দিয়ে সংসার হয় না ব্যাটাছেলের। আমরা বিয়োলে তবে তাদের ভাগ্যে ছেলেমেয়ে জোটে। বাদ দিক না আমাদের। রোজগার করা টাকা নিয়ে করবে কি ? চিবিয়ে খেয়ে ধন্য হবে ?

এসব শেখানো বুলি। এটুকু টের পেয়েছিল মণিমালা। কিন্তু জবাবে কিছুই বলতে পারে নি। এটাও টের পেয়েছিল, সে জবাবে যা বলবে তাও হবে শেখানো বুলি।

তারা শেখানো বুলি বলে এইটুকু শুধু সে ধরতে পেরেছে—সরলার সঙ্গে জ্ঞানে বুদ্ধিতে এইমাত্র তার তফাৎ।

২

মণিমালা মেয়ের নাম রাখে ইন্দ্রাণী।

তার আগেই প্রাণেশ্বরের নাম-করণ হয়ে গেছে।

কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে সরলাকেও মণিমালা খেতে বলেছিল।

প্রাণেশ্বরের নাম-করণের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল মাত্র কয়েকদিন আগে—সেদিন কিছুই বলে নি। মেয়ের নাম-করণের দিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসেছিল, ওর প্রাণেশ্বর নাম রাখলেন কেন?

: শাশুড়ীর সখ আর জিদ!

: ও!

নিজের নাম সম্পর্কে প্রাণেশ্বরের আপত্তি প্রকাশ পেয়েছিল অল্প বয়সেই।

মামাতো বোনের বিয়ে। প্রাণেশ্বর বেঁকে বসেছিল, সে মামাবাড়ী যাবে না। এ জীবনে আর কোনদিন যাবে না।

কেন যাবে না? মামা বাড়ীতে সবাই তাকে এত আদর করে?

: বিচ্ছিরি আদর, আদরের চোটে নিস্‌কে পিস্‌কে দেয়। খালি খালি আমার নাম নিয়ে যা তা বলবে।

: কি যা তা বলে?

: কতরকম বলে—তুই কোন গোপিনীদের প্রাণেশ্বর রে? তোর রাধাটির নাম কি রে? লুকিয়ে লুকিয়ে ননী চুরি করিস না কি রে?

সরলা হেসে বলেছিল, আচ্ছা যা এবার আর কেউ তোর নাম নিয়ে তামাসা করবে না, সবাইকে বারণ করে দেব।

প্রাণেশ্বর কিছুতেই রাজী হয় নি। আদরের চোটে মামীরা তাকে পাগল করে দেয়। সব চেয়ে বেশী জুলুম নাকি করে মুটকী সেজ মামী। গায়ের জোরে বুকে চেপে দলে মলে চুমো খেয়ে তার দম আটকে দেয়।

তাছাড়া মামাবাড়ী গেলেই সবাই বলবে, এটা খা ওটা খা সেটা খা—পেট ফুলিয়ে মারার জন্য দিদিমা দিনরাত পিছনে লেগে থাকবে। মামাবাড়ী গেলে প্রত্যেকবার তার আদরের চোটে খেয়ে খেয়ে পেটের অসুখ হয়।

: তুই বুঝি লোভের বসে খাস না ভাল ভাল খাবার ?

এতবড় পণ্ডিতের ছেলে। এমন গোঁড়া শাক্ত পরিবারে মানুষ।

তবু দিন দিন কি যে মতিগতি হতে থাকে ছেলেটার।

ভক্তি করতে শেখে না। আচার নিয়ম মানে না। কাউকে ভয় ডর করে না। অস্থির দুরন্ত একগুঁয়ে একটা জীবন্ত অনিবার্য দুর্ভাবনা হয়ে উঠতে থাকে সকলের।

বড় হবার পরে নয়, ছেলেবেলা থেকেই এই সব লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেতে থাকে।

স্কুলের ছেলে কি না তর্ক জুড়ে দেয় এত বড় পণ্ডিত বাপের সঙ্গে !

নিজের নামকরণ নিয়ে ঝগড়া করে।

: মস্ত পণ্ডিত তুমি ! আমার আর একটা নাম খুঁজে পেল না!

: কেন, প্রাণেশ্বর তো খাসা নাম। ঈশ্বরচন্দ্র নাম নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কত বড় হয়েছিলেন, তুই তাঁর চেয়ে বড় হবি, তোর নামে আমি 'প্রাণ' শব্দটা লাগিয়ে দিয়েছি।

: তা হবে না। তুমি যাই কর—এ নাম আমি পাল্টে দেবই। ছেলের নাম রাখে প্রাণেশ্বর—তুমি সেকেলে গেঁয়ো পণ্ডিত।

: জগদীশ্বর, ভুবনেশ্বর, প্রণবেশ্বর, যাদবেশ্বর—এত সব সেকেলে নাম বাদ দিয়ে প্রাণেশ্বর নাম রাখলাম, তবু বলছিস আমি সেকেলে ? প্রাণেশ্বরের চেয়ে মডার্ণ নাম বল দেখি একটা ? 'চন্দ্র' 'নাথ 'কুমার' এসব যোগ না দিয়েই যে নামের মানে হয় ?

: নাম হল নাম—নামের আবার মানে থাকে নাকি ?

: থাকে না ? সব কিছুর মানে থাকে। এ জগতে অর্থহীন কিছু কি থাকতে পারে রে পাগলা ! লোকে ক খ গ ঘ কিম্বা এক দুই তিন চার

কিম্বা এক্স্ ওয়াই জেড নাম রাখে না কেন? ঈশ্বরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তোর নামটা একেলে হয়েছে। তুই অনায়াসে প্রাণেশ্বর ভট্টাচার্য নাম জাহির করতে পারবি—চন্দ্র বা নাথ বাদ দিয়ে নাম জাহির করতে গেলেই লোকে ওদের ছ্যাবলা বলত।

: তোমার খালি পণ্ডিতি প্যাঁচের তর্ক। এখুনি না বললে যে নামে কি আসে যায়, গুণটাই আসল?

: যার নামের ঠিক নেই, তার গুণ থাকে? যারা মানুষ করবে তারাই তো নাম দেবে? ছেলের ভাল একটা নাম যারা দিতে পারবে না, তারা কোন গুণে গুণী করতে পারবে ছেলেটাকে? যেমন ধর, একজন খুব নাম করা লোকের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নামটার কোন মানে হয়? নামটা আর উপাধিটা জগতের কোন ভাষায় কোন ব্যাকরণে টিঁকতে পারে না। তবু, মানুকে শর্মা নাম নিলেও লোকটার নাম হত। কেন জানিস? লোকে জানে এটা ছদ্ম নাম। এটা বিনয়ের প্রমাণ—আরেকটা গুণের প্রমাণ। যে গুরুতর কাজে নামলাম, যে কাজ অনেকে প্রাণ দিয়েও ঠিকমত করতে পারে না, যে কাজ করতে পারলে খুব নাম-ডাক হয় আর না করতে পারলে নিন্দা হয়—সে কাজ করতে নেমে নিজের নাম জাহির করার কি দরকার।

: তার মানেই সাহস নেই নিজের নামটা জাহির করার। প্রশংসা হয় ভাল, না হলেও কেউ জানবে না। লেজ গুটিয়ে ফিরে আসা যাবে।

: তা নয় রে, তা নয়। এটা বিনয়ের লক্ষণ। আত্মীয় স্বজনের মান রাখা। একটু নাম হলেই কম বয়েসী বন্ধুরা মাথায় তুলে নাচবে—এ লোভটা সামলাতে হয়।

: তুমি যাই বল—নামটা আমি বদলাবই।

: বদলাব কেন? এখুনি বদলা না!

প্রাণেশ্বর রেগে মেগে চেঁচিয়ে বলে, তোমাদের জন্যেই তো পারছি না। স্কুলে নাম লিখিয়েছ, পোষ্টাপিসের সেভিংসের খাতায় নাম লিখিয়েছ—যত সব

সেকেলে গেঁয়ো ভূতের কাণ্ড। দাঁড়াও না, ক'বছর পরে সাবালক হয়ে নি, কোর্টে গিয়ে নাম যদি না আমি বদলাই—

বড় মেয়ে হয়তো রেগে বলে, দাও না বেয়াদবটার গালে একটা চড় কষিয়ে? তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি জুড়েছে!

কিন্তু রামনাথ কোনদিন ধৈর্য হারায় না, রাগ করে না, প্রাণেশ্বরকে ধমকায় না। শান্তভাবেই রামনাথ জিজ্ঞাসা করে, তোকে কে বলল সাবালক হলে কোর্টে গিয়ে নিজেই নাম পাল্টাতে পারবি?

: সমরবাবু বলেছেন।

সমর মানে মণিমালার স্বামী।

এ উন্মাদকে নিয়ে কি করা যায়?

আদর মানে না, শাসন মানে না। উল্টে আদর করতে চায়, পালন করতে চায়।

মন দিয়ে উপদেশ শোনে।

মনে হয় প্রাণে যেন তার ঢেউ উঠেছে, বড়ই সে ব্যাকুল হয়েছে দামী দামী খাঁটি কথাগুলি শুনে।

নিজেকে শুধরে নেবার চেষ্টা নিশ্চয় এবার করবে প্রাণেশ্বর।

সকালে ছাঁদা প্রসাদের জল খাবার খেতে খেতে উপদেশ শুনছিল। বলি দেওয়া কচি পাঁঠার মাংসের ঝোলের ভাগ প্রাণেশ্বর আর কয়েকজন ছোট্ট ছেলেমেয়ের জন্য তুলে রাখতে হয়।

অমাবস্যার অন্ধকার রাত কেন, পূর্ণিমায় উজ্জ্বল রাতেও ওরা প্রাণপণ চেষ্টায় সবাই মিলে রাত দশটা বাজাতে পারে না। কেউ কেউ এগারোটা পর্যন্ত টেনে চলে।

একমাত্র প্রাণেশ্বর বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে মাঝে মাঝে।

খিদের বায়না নিয়ে সবাইকে জ্বালাতন করে।

কত কিছু খাবার ঘরে তৈরী আছে, দোকান থেকে কতরকম তৈরী খাবার আনিয়ে দেওয়া যায়, মাংস খেতে চেয়ে প্রাণ তার ব্যাকুল হয়ে থাকলে হোটেল রেষ্টুরাণ্ট থেকে মাংসই আনিয়ে দেওয়া হচ্ছে—যত খুসী সে খাক না।

বলির পাঁঠার রান্না করা প্রসাদ মাংস ছাড়া কিছুই প্রাণেশ্বর খাবে না।

খিদেয় কেঁদে সবাইকে জ্বালাতন করে ঘুমিয়ে পড়বে মাঝরাত্রি পার করা ঘণ্টা বাজানোর মধ্যে—তবু এক চুমুক দুধ বা দু'একটা রসগোল্লা সন্দেশ বা পিঠা মণ্ডা তক্তি তাউস মুখে দেবে না।

ভক্তির জন্য নয়। সে বরং ঘোষণা করত যে তাড়াতাড়ি পূজো করে বলি এক সময় দিলেই হয়—তারা মিছিমিছি দেরী করছে!

তার খুসিমত সময়ে পাঁঠা বলি দেওয়া হবে না, তার বাঁধা ধরা খিদের সময় পাওয়া যাবে না বলি দেওয়া পাঁঠার মাংসের ঝোল, এই অভিমানে প্রাণেশ্বর ভাল ভাল দামী দামী খাবার চেখে পর্যন্ত না দেখে সারারাত উপোস দিত। তাকে তুলে খাওয়ানো অসম্ভব ছিল।

যত বড় হতে থাকে মুখ দিয়ে যেন কথার খই ফুটতে থাকে প্রাণেশ্বরের। রামনাথের কাছে কয়েকজন ছাত্র পড়তে আসে। তাদের মধ্যে কেউ সংস্কৃতে উপাধি-প্রার্থী, দু'একটা উপাধি পাওয়া কেউ কেউ আবার বড় উপাধির জন্য তালিম চায়।

মীমাংসার সন্ধানে এসে তাকে মধ্যস্থ মেনে পণ্ডিতেরাও তর্ক চালাত। প্রাণেশ্বর কি বুঝত সে-ই জানে—একেবারে যেন মশগুল হয়ে বাপের পড়ানো, পণ্ডিতদের তর্কাতর্কি আর রামনাথের উদ্ধৃতি আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনত।

প্রাণেশ্বরের স্মরণশক্তি যে অসাধারণ ছিল সন্দেহ নেই। না বুঝেও ওই সব বড় বড় শোনা কথা নিয়ে সে বক বক করে যেত অনর্গল—কোন একটা সূত্র ধরে শোনা কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জড়িয়ে পেঁচিয়ে বলত যে অনেকে ভাবত বুঝি পড়ে পড়ে মুখস্ত করেছে। সেই সঙ্গে চূড়ান্ত বুড়োমি আর পাকামি। সংসারের সব ব্যাপারে কথা বলা চাই, কাউকে কিছু না জানিয়ে কোন কোন ব্যাপারে কর্তালিও করা চাই।

দায়টা হয় তো সম্পূর্ণরূপে বড়দের। একটানা শলা পরামর্শ চলছে—কি করা যায়। কোন ফাঁকে একটা হেস্ত নেস্ত করে ফেলে তাকে সকলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হত।

বলত, কেন? ভুল করেছি? অন্যায় হয়েছে? তোমরা এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করতে পারতে? কদিন ধরে তো শুধু বকর বকর ক'রে চলেছ সবাই মিলে!

: তোর তা দিয়ে দরকার, কি? তুই ছেলেমানুষের মত থাকবি!

: বাঃ, বেশ কথা। তোমরা সব ভেস্তে দিচ্ছ, চুপচাপ মুখ বুজে থাকব?

কেউ কেউ আপশোষ করে বলে, এই বয়সে তোমার মতিগতি এরকম হয়ে গেল কেন প্রাণেশ?

জবাবে প্রাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করে, মতিগতি মানে কি? মতির গতি না মতি আর গতি? আমি মতি মানে বুঝি, গতি মানেও বুঝি। মতিগতি জড়িয়ে কি মানে হয় বুঝি না।

ইয়ার্কি দিচ্ছে? অথবা সত্যই ধাঁধাঁয় পড়েছে ছেলেটা? মাথা যে আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ রাখে নি। পদে পদে প্রমাণ দিয়ে চলে যে ছোঁড়া খাপছাড়া রকমের চালাক-চতুর।

সেই সঙ্গে আবার ভাবুকও বটে।

বেশ বড় রকমের একটা হৃদয় যে আছে, মাঝে মাঝে হৃদয়টার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে তার মাথা যে হার মানে, তাও কম জানা নয় সকলের। মায়া কি তার কম? আপনজন ছাড়া পরের জন্যও?

কিন্তু আবার মায়া করার অতি উচিত কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে তার বুঝি তৈমুরলঙকেও হার মানানো নিষ্ঠুরতার মানে বোঝা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কারও মারফতে কাণে গিয়ে থাকবে শ্যামাদাসের। গান গেয়ে আসর জমাতে আর সংসারী মানুষের হিসাবে অকাজে মেতে জীবন কাটাতে মানুষটা তুখোর।

একই আসরকে সে একবার শ্যামাসঙ্গীত এবং আরেকবার কৃষ্ণ কীর্তন গেয়ে দু' দুবার জমিয়ে দিতে পারে।

কাজে করে দেখিয়েও দিয়েছে যে পঞ্চাশ পেরোতে পেরোতে এ আন্দোলন, ও আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে কয়েকবারের মোট হিসেবে ক'বছর জেল খেটেও আসতে পারে।

যখন যা করে তা প্রাণ দিয়েই করে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবই যেন প্রাণের সখে করে।

ডিগ্রির সখ বোধ হয় প্রাণে জাগে নি, স্কুলের পরীক্ষাগুলি প্রায় নাক সিঁটকানো অবজ্ঞা অবহেলার সঙ্গে পার হয়ে এসেছিল।

তাই, প্রাণে বিদ্যালাভের সখ জাগায় ঘরে আর জেলে রাশি রাশি বই পড়ে ফেলেছে এলোপাথারি।

রাণীর বিয়ের রাতে প্রাণেশ্বর গোমড়া মুখে সিগ্রেট বিলি করছিল নিমন্ত্রিত মানুষদের। সব কাজ সব দায় পরিহার করে সে যেন শুধু এই সিগ্রেট বিলির দায়টুকু নিয়েছে রাণীর অবাঞ্ছিত বিয়েটা শেষ পর্যন্ত মেনে নেবার স্বীকৃতি ঘোষণা করতে!

মহেন্দ্রের সঙ্গে রাণীর বিয়ের কথাবার্তা আরম্ভ হবার সময় থেকেই সে রুখে দাঁড়িয়েছিল এই বিয়ের বিরুদ্ধে।

তার আবদার আপত্তি অগ্রাহ্য করেই অবশ্য মহেন্দ্রের সঙ্গে রাণীর বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

এমন পাত্র ছাড়া যায় না।

শ্যামাদাসের পেশা ডাক্তারি—তেমন পশার না থাকলেও চলে যায়। কলেজে যথারীতি ডাক্তারি পড়া সুরু করেছিল এটা জানা কথা কিন্তু কতদিন পড়েছিল কেউ জানে না।

রামনাথের পরিবারের সঙ্গে তার অনেকদিনের জানাশোনা—বিনা ভিজিটে রোগী দেখতেও আসে, এমনিও আসে। সাধারণ অসুখ বিসুখেই সে ওষুধ দেয়, একটু কঠিন হলে নিজে চিকিৎসা করে না, ভিজিট নেওয়া পাশ করা ডাক্তার ডাকায়। নিজেই বলে যে এটা তার বিনয় নয়, রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসা করার অক্ষমতার জন্যও

নয়—এটা প্রেক নিজেকে বাঁচিয়ে চলা। রোগীর কিছু হ'লে সে দাঁড়াবে কোথায় ?

সত্যই যে বিনয় বা অক্ষমতা নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় পাশ-করা নাম-করা ডাক্তারকে তার জেরা করা আর উপদেশ দেওয়া থেকে !

রাণীর বিয়ের দিন কোথায় যেন গিয়েছিল, সন্ধ্যাবেলা এসে ঘণ্টাখানেক বসে ঠিক যেন নিমন্ত্রণ রেখে যায়। ছুটো রোগী দেখে আবার ফিরে আসবে। ঘণ্টাখানেক বসে কিন্তু গান শোনায় মোটে একটা, প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় যে রোগী দেখে এসে ছুটো জমকালো গান শোনাবে।

শ্যামাদাসের গান জমে নি। প্রাণ দিয়ে গান করেনি নিশ্চয়। যে রোগী দেখতে গিয়েছিল ডাক্তার হিসাবে তাদের বাড়ীতে তেমন বোধ হয় সম্মান পায় নি। গান গেয়ে আসর জমায় জেনে তার রোগীদের মনে খটকা লেগেছে চিকিৎসা করে রোগ সারাতে আর পটুত্ব কতখানি। সে গায়ক না ডাক্তার। তার আসল কাজটা কি ? আদর্শ এবং উদ্দেশ্যটা কি ?

গান শেষ করে ডেকে বলে, : আমায় একটা সিগ্রেট দে তো প্রাণেশ।

শ্যামাদাস নিজে তো ধূমপান করেই না, ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে একরকম প্রচার চালিয়ে যাওয়ার মত সবদা সকলকে সাবধান করে দিয়ে বেড়ায়। অল্প বয়সে সিগ্রেট ধরেছে বলে এই সেদিন কি কড়া ঘ্যাঁতানিটাই সে প্রাণেশ্বরকে দিয়েছিল !

প্রাণেশ্বর তাই আশ্চর্য হয়ে বলে, সিগ্রেট খাবেন ?

: তুই দয়া করে দিলে খাব। না দিলে খাব না।

সিগ্রেট দিতে কাছে যেতেই শ্যামাদাস এক হাতে সিগ্রেট নিয়ে আরেক হাতে তার কাণ পাকড়ে ধরে।

হাসিমুখে চড়া গলায় কড়া স্বরে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে ছোঁড়া, মতিগতি কথাটার মানে নাকি তুই জানিস না ? এই বুঝি বিদ্যের দৌড় ? কেন, ডিক্‌সনারিটা খুলে কি মানে লিখেছে দেখতে পারিস নি ?

শ্যামাদাসের কড়া হাতে কাণের টানে উবু হয়ে দাঁড়িয়েও প্রাণেশ্বর আরও গলা চড়িয়ে খনখনে আওয়াজে বলে, ডিক্‌সনারি দেখেছি, মানে বুঝি নি। বুঝিয়ে দিন না মাষ্টারমশায় ?

শ্যামাদাস কাণ ছেড়ে দিলে সে তার মুখোমুখি বসে। সকলে কথা বন্ধ করে তাদের দিকে চেয়ে আছে। কারো মুখে কৌতুকের হাসি, কারো মুখ গম্ভীর।

শ্যামাদাস বলে, মতি মানে জানিস ?

প্রাণেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, মতি মানে ইচ্ছা, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, মন—

: থাক্ থাক্। গতি মানে জানিস ?

: গতি মানে চলন, যাত্রা, উপায়, ব্যবস্থা, আশ্রয়, শরণ, সৎকার—

: থাক, থাক। বুঝে গেছি, তোর শুধু মুখস্ত বিদ্যা। নইলে মতির মানে গতির মানে খটাখট বলে যাস আর মতিগতির মানে বুঝিস নে !

মুখ তুলে সকলের দিকে চেয়ে শ্যামাদাস বলে, এই রকম শিক্ষাই হয়েছে আজকাল। একটা শব্দের মানে হল আরেকটা লাগসই শব্দ—বদলি শব্দটা বলতে পারলেই পুরো নম্বর ! শুধু আজকাল কেন ? আগেও এরকম ছিল। কম দুঃখে কবি কালিদাস বাগার্থমিব সম্পৃক্তৌ বলে হরগৌরীকে প্রণাম জানিয়ে কাব্য লেখা সুরু করেছিলেন ?

একজন মন্তব্য করে, দিবারাত্রি মুখস্ত করেও পাশ আর ছেলেমেয়েরা করছে কোথায় মশাই ? পুরো নম্বর !

বাড়ীর ভিতরে একটা চাপা গোলমালের আওয়াজ শ্যামাদাসও একটু কাণ পেতে শোনে। সকলের মত সেও টের পায় গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটেছে।

ছেলেমানুষী কৌতূহলে বিচলিত না হয়ে সকলকে শুনিয়ে সে বলে, এ ছোঁড়া মতি শব্দের প্রতিশব্দ মুখস্ত করেছে—আসল মানেটা বোঝেনি যে কথাটার মানে সবরকম মানসিক ক্রিয়া। মনে যা কিছু ঘটে তাই হল মতি। মতি মানে মনের কাজ। গতি কথাটার তাৎপর্যও ছোঁড়ার মাথায় ঢোকে নি।

এ শব্দটারও কতগুলি প্রতিশব্দের মানে শিখে রেখেছে। বেচারা জানেও না যে গতির আসল মানে বাঁই বাঁই ছোটা নয়, একটা কিছু উপায় করে দেওয়া নয়, মড়াটাকে পুড়িয়ে তার সদ্‌গতি করা নয়—গতি মানে কাজ।

অধ্যাপক সুরপতিবাবু অসহ্য ক্রোধে ধৈর্য হারিয়ে চীৎকার করে ওঠেন, কি বলছেন পাগলের মত? গতি মানে কাজ!

শ্যামাদাস মুখ খোলার আগেই প্রাণেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আবেগের সঙ্গে বলে, না, না, উনি ঠিক বলেছেন, গতি মানেই কাজ। এবার বুঝতে পেরেছি মতিগতির মানে! মন অনেক রকম চায়, সেটা হল মতি। কাজে যেটুকু করার চেষ্টা হয় সেটা হল গতি।

বলে' প্রাণেশ্বর প্রণাম করতে যাবে শ্যামাদাসের পায়ে, শ্যামাদাস তাকে বুকে জাপটে ধরে বলে, কে বলে এ ছেলেটার মতিগতি খারাপ? যে বলে আমি তার মাথায় লাঠি মারব বলে রাখছি।

রাণীর বিয়ে সে রাত্রে হয় না।

রান্না হয়ে গিয়েছিল বলে, নিমন্ত্রিতেরা হৈ চৈ করতে করতে ভোজ খেয়ে ফিরে যায়।

কি করে বিয়ে হবে?

কনে উধাও হয়ে গেছে। রাণীর কোন পাত্তা নেই।

চেলি গয়না পরিয়ে চন্দনের ফোঁটায় মুখখানাকে ছবি করার আয়োজন শুরু হবে, রাণী প্রকৃতির ডাক রাখতে গেল।

কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

মহোৎসাহে কোমর বেঁধে কনে সাজাতে তৈরী হয়েছিল বাড়ীর এবং পাড়ার কয়েকজন কমবয়সী এবং মাঝবয়সী মেয়ে বৌ। এই কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের মনের কথা আদান প্রদানে কি সহানুভূতি নিন্দা সমর্থন যে প্রকাশ পায় প্রাণেশ্বরের প্রতি—এ বিয়ে ঠেকানোর জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টায় কেলেঙ্কারি করেছিল বলে!

সুবর্ণ শুরু করেছিল কথাটা। রাণী অছিলা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সে বলেছিল, মেয়েটার মোটে মন নেই এ বিয়েতে। সারা জীবন নিজে জ্বলবে, স্বোয়ামীটাকে জ্বালিয়ে মারবে। স্বোয়ামীটা যদি-অবশ্য দু'চার বছর বাঁচে।

সৌদামিনী বলেছিল, যদি অবশ্য বাঁচে মানে?

: বাঃ রে বা, প্রাণেশ কি মিছেই এ বিয়ে ঠেকাতে লাফালাফি করেছে, পাগলামি করেছে? মহেন্দ্রর টি. বি. হয়েছিল জান না তোমরা? তিন বছর ভুগে বাপদাদাকে ভুগিয়ে কত চিকিচ্ছের সেরেছে। সেরেছে না ছাই, এ রোগ নাকি সারে! অ্যাদ্দিন আদর করে ডিম মাংস দুধ খাইয়েছে, দামী দামী ইনজকসন দিইয়েছে, এবার বৌয়ের সাথে লাগবে খিটিমিটি। বিয়ে দিচ্ছে ওরাই, বৌ গেলে ওরাই বিরূপ হবে। বাঁচে বাঁচুক, মরে মরুক—কে কার বাঁচা মরার ধার ধারে!

এই সব কথা চলে। রাণীর ফিরতে দেরী হওয়ায় বিরক্তি বাড়ার সঙ্গে এই সব কথারও জোর বাড়ে।

সত্যি এ বিয়েতে রাণীর দারুণ বিতৃষ্ণা। বোনকে বাঁচাতে চেয়ে চেষ্টা করে অনেকের কাছে বদ হয়ে গেছে প্রাণেশ্বর।

আহা, বেচারা!

কিন্তু কলঘর থেকে রাণী ফেরে না কেন? গলায় দড়ি দেয় নি তো কলঘরে গিয়ে?

পিসী কাতর কণ্ঠে বলে, তোরা একজন যা বাছা। দেখে আয় গে কি কাণ্ড করছে মেয়েটা।

সুবর্ণ একপায়ে খাড়া ছিল। রাণীর কলঘর সেরে ফেরার সময় পার হয়ে যাবার আগে থেকেই তার বুকটা ধুকপুক করছিল।

কলঘর আর সারা বাড়ী খুঁজে পেতে ঘুরে এসে সুবর্ণ ঘোষণা করে, রাণী পালিয়েছে।

নানা সুরে কলরব ওঠে, পালিয়েছে কি রে ?

কাণ্ড বটে !

আত্মীয় বন্ধু বরযাত্রীরা এসে জুটেছে। রোগা ফর্সা বর এসেছে রাজপুত্রের বেশে, ঠিক যেন অতীতকে বিদ্রূপ করার আধুনিক একটি সং। বৈশাখের গরমে ঘামতে ঘামতেও সবাই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এই ভেবে যে ছেলেমেয়ে একত্রীকরণের চিরাচরিত ব্যাপারটা আরেকবার চোখে দেখতে দেখতে আনন্দ জাগবে বিনা পয়সায় সিনেমা দেখার মত, উপরি জুটবে এমন পেটের খ্যাঁট যে পরদিন পেট ছুটে দিন তিনেক আগুনে পোড়া বাজারে যাওয়া বন্ধ রাখা যাবে।

কিন্তু রাণী গেল কই ?

এটাই তো এখনকার এই লগ্নের আসল কথা। কে কি ভাবছে না ভাবছে সে হিসেব পরেও হতে পারবে।

রামনাথ ধীর শান্তভাবেই এদিকে ওদিকে খোঁজখবর নিতে থাকে, তারপর আসরে এসে সকলের সামনে প্রায় উন্মাদের মত আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, প্রাণেশ, রাণীকে কোথায় সরিয়েছিস ?

বাপের প্রায় এই সামাজিক আত্মহত্যার মত বোকামিতে প্রাণেশ্বরের প্রাণ কেঁদে ওঠে।

কিছুই না জানিবার ভাণ করে চুপ করে থাকলে তার দিক থেকে চুকে যেত কেলেঙ্কারির ব্যাপার।

কেউ তো জানে না যে তারই পরামর্শে আর ব্যবস্থায় রাণী কনে সাজান'র আসর থেকে চলে গিয়েছে—তাদের মেজ মামা চন্দ্রনাথের আশ্রয়ে সেই সুদূর লক্ষ্ণৌতে।

গিয়েছে মানে রওনা হয়ে গিয়েছে।

মামার সঙ্গে নয়, মামীর সঙ্গে।

মামা বড় ব্যস্ত। আজ কালের মধ্যে জেলে যেতে হবে কি হবে না ঠিক নেই। আধা ইংরেজ মেজমামী ভুতপূর্বা মিস্ লরেটা দত্তগুপ্তা তাই পিছনের দরজা থেকে রাণীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে লক্ষ্ণৌ-এ।

কীর্তিটা প্রাণেশ্বরের।

উপায় ঠাওরাতে ঠাওরাতে দেখা হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্ণৌ-এর ওই মেজমামীর সঙ্গে।

সব শুনে লরেটা বলেছিল, বানিয়ে বলছ না তো? চলো এখুনি গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে আসি। দরকার হয় তো বলো পুলিশ নিয়ে যাব।

লরেটা একটু হেসেছিল।

প্রাণেশ্বরও হেসে বলেছিল, ওসব প্ল্যান পরে হবে মামী, পরে দেখা যাবে। আমি এদিকে চেষ্টা চালিয়ে যাই, দেখা যাক কি হয়। নইলে শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গেই ভাগিয়ে দেব।

মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, নিজের বোন হলে কি হবে মামী, জন্মো জন্মো শিকলপরা দাসী হয়ে থেকেই খুসী মেয়ে। পাত্রটিও নেহাৎ মন্দ নয়। রাণীকে আমার বিশ্বাস নেই। সব ঠিক করব, শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসে বলবে, যাক গে যাক, যা আছে কপালে তাই হবে। বলে একটু কাঁদবে—ফুরিয়ে গেল। না, বোকা বনতে পারব না।

: তোমায় এত টায়ার্ড লাগছে প্রাণেশ্বর? খাও নি?

: খেয়ে বেরিয়েছি তো?

: কখন বেরিয়েছো?

: সাতটা নাগাদ?

মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে সময়ের আন্দাজী গতি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছিল প্রাণেশ্বর, মাথা নামাবার সময় তার নাকের সামনে লরেটার বাড়িয়ে ধরা রিষ্টওয়াচে নাকের ডগাটা একটু ছড়া লেগে জ্বালা করতে থাকলেও হেসে ফেলেছিল।

: জানি, জানি। কি করব? আশে পাশে কোথাও একটা ঘড়ি লটকানো নেই, শালার সহর। কাকে আবার জিজ্ঞাসা করব, বিরক্ত হবে। সবাই যেন ঠিক পাগলের মত ব্যস্তবাগীশ। তার চেয়ে আকাশের দিকে

চেয়ে সময় আন্দাজ করাই ভাল। নিখুঁত সময় জেনে কি দরকার আমার—কারো চাকরিতো করি না ?

ঃ সাথে আয়।

নাম করা দোকানে নিয়ে গিয়ে একটা দামী ঘড়ি কিনে লরেটা তার কব্জিতে পরিয়ে দিয়েছিল।

মেজমামীর সঙ্গে বিয়ে পণ্ড করার ফন্দি এঁটে প্রাণেশ্বরের আপত্তি যেন উপে গিয়েছিল। সজীব হয়ে উঠে সে খেটেছে খুটেছে ছুটোছুটি করেছে দুপুর পর্যন্ত। ঠিক ছিল দুপুরবেলা এক ফাঁকে সে রাণীকে নিয়ে লরেটার হোটেলে পৌছে দিয়ে আসবে। শেষ মুহূর্তে রাণী গেল মুষড়ে। ঠিক প্রাণেশ যা আশঙ্কা করেছিল। রাণী কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলেছিল, থাকগে, কাজ নেই। হৈ চৈ হবে, বাবার মনে লাগবে—

বোনের বিয়েতে আবার বিরক্তি জন্মে গেল তার। নিরুৎসাহের অবধি রইল না। একেবারে ঝিমিয়ে গেল।

কেউ আর ডেকে তার সাড়া পায় না। সামনে গিয়ে কিছু বললে যেন মুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

নেহাৎ গুরুজন হলে একবার কেসে হাই তুলে বিরক্তির সুরে বলে, আমার ভাল লাগছে না, শরীর ভাল নেই।

বলেই গুরুজনটির নাগালের আড়ালে চলে যায়।

শরীর ভাল নেই বললে কি রক্ষা আছে তাদের বাড়ীর কোন গুরুজনের কাছে !

জেরা চলবে এক ঘণ্টা, কেন শরীর খারাপ হয়েছে, কি রকম শরীর খারাপ হয়েছে—হুকুম হবে শুয়ে থাকার।

তাড়াতাড়ি ডাক্তারও হয় তো আনা হবে। ব্যাপার বুঝে ডাক্তার দেবে নির্দোষ ভাল ভাল দামী দামী ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা।

কম পক্ষে দু'তিন দিন শুয়ে তাকে থাকতেই হবে, ওষুধ পথ্য খেতেই হবে।

গুরুজনদের এড়িয়ে চলাই ভাল।

কনে সাজাবার সময় প্রাণেশ গিয়ে রাণীকে কাণে কাণে বলে, মেজমামী গাড়ী নিয়ে মোড়ে অপেক্ষা করছে। এই কিন্তু শেষ সুযোগ। বরের চেহারাটা একবার দেখেছিস? কেন সারাজীবন কেঁদে মরবি—মামীর সঙ্গে পালা।

কে জানে হঠাৎ কেন রাণী মরিয়া হয়ে উঠেছিল!

প্রাণেশ্বরের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে যে পাটনায় গিয়ে তিন মাসের মধ্যে রাণী একটা চিঠি পর্যন্ত তাকে লেখে না।

না নিজের মা বাবা খুড়ী মাসী দিদি বা অন্য কোন আপনজনের কাছে, না প্রাণের সখী মঞ্জু লীলাদের কাছে।

অন্ততঃ তাকে একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল।

এত করে সে-ই তো সামলে দিল? মেয়েরা কী ভীষণ অকৃতজ্ঞ হয়!

তিন মাস পরে সকলের নামে মামার ছাপানো চিঠি আসে—রাণীর বিয়েতে সকলকে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে।

নিমন্ত্রণ পত্রেই লেখা আছে পাত্রের পরিচয়। শুধু উচ্চ শিক্ষিত নয়, উচ্চ পদের চাকুরে।

যে বিয়ে ভেস্তে গেছে রাণীর, তার চেয়ে শতগুণ ভাল বিয়ে। কিন্তু কী সর্বনাশের কথা!

পাত্রের নাম সত্যেন ঘোষ!

এম, এ কাব্যবিশারদ বেদান্তবাগীশ জ্যোতিষার্ণব সিদ্ধান্ত-সরস্বতী ইত্যাদি উপাধিযুক্ত ভট্টাচার্য রামনাথের মেয়ের বিয়ে হবে শুধু এম, এস্-সি উপাধিধারী ঘোষ বংশের একটা ছেলের সঙ্গে!

রামনাথের নিজের ছেলের বাঁদরামির জন্যই দুর্ঘটনা ঘটেছিল রাণীর বিয়ের রাত্রে—তারই জের টেনে ঘটল এই অঘটন!

খবর শুনেই জগদম্বা আর্তনাদ করে বলে, তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে। তোর ঘরে শনি এসে জন্মেছে রামু। ত্যাগ কর, দূর করে দে—

রামনাথ ধীর স্বরে বলেছিল, এত চেঁচাও কেন মা ? বাবা কি সাধে বলতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে না এসে তোমার উচিত ছিল জেলে-বাগ্দীর ঘরে যাওয়া ? কিছু বুঝলে না শুনলে না, চেঁচিয়ে পাড়া তোলপাড় করে দিলে।

আশির কাছে গিয়েছিল জগদম্বার বয়স। শণের মত সাদা চুল খসে খসে পড়ছিল। গায়ের চামড়া ঢিল হয়ে লোল হয়ে কুঁচকে পাকিয়ে যাচ্ছিল।

গলাটা হয়ে গিয়েছিল সরু।

চেঁচাতে সুরু করলে কি উঁচু পর্দাতেই উঠত তার গলা। মনে হত, মাইল খানেক দূরের বড় কারখানাটায় সাইরেনের আওয়াজকেও বুঝি ছাড়িয়ে যেত !

ধপ করে বসে মাথায় পাকা শণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে উকুন হাতড়াতে হাতড়াতে বলেছিল, কে জানে তোদের কি বুদ্ধি !

রামনাথ বলেছিল, বুদ্ধি আমাদের ভালই। নিয়ম হল, শাস্ত্রে বলেছে, পঞ্চাশ পেরিয়ে বনে যেতে হবে। সে দিনকাল তো আর নেই। আশি বছর বয়স হয়েছে, ঘরে থেকে আমায় জ্বালাচ্ছ।

: তোর বয়স পঞ্চাশ পেরোয় নি রামু ?

: আমার পেরোনো আর তোমার পেরোনোতে অনেক তফাৎ !

: এরকম পেরোনোর মানে তোর বাবাও বুঝত না, আমিও বুঝতাম না। মানতে হবে তাই মেনে যেতাম।

: তাহলে চেঁচাচ্ছ কেন ? আড়াই শ' টাকা মাইনের একটা ছেলের সঙ্গে রাণীর বিয়ে হয়েছে—ভালই তো হয়েছে।

হাসপাতালের আঁতুরেই জানা গিয়েছিল মণিমালার মেয়ে খুব সুন্দরী হবে।

কিন্তু কলায় কলায় তার রূপের যে এমন বিকাশ ঘটবে কেউ তা কল্পনা করতে পারে নি।

সমরের টকটকে রঙ কিন্তু মুখের চেহারা ভাল নয়। মণিমালা শ্যামবর্ণা কিন্তু মুখখানা যেন তার ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা।

ইন্দ্রানী রঙ পেয়েছে বাপের, মুখশ্রী পেয়েছে মার।

কিন্তু এমন গড়ন সে পেল কোথায়? বাপের রঙ আছে, মায়ের মুখশ্রী আছে—কিন্তু দেহসৌষ্ঠব বলে কিছুই তো তাদের নেই!

সৃষ্টির এ এক রহস্যময় ব্যাপার সন্দেহ নেই। তবে জ্ঞান বিজ্ঞানের কল্যাণে সবটাই আজ আর রহস্য নেই। এটা জানা গেছে যে প্রাণীর কোন দৈহিক বৈশিষ্ট কয়েক পুরুষ চাপা থাকার পর কোন সন্তানের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে পারে।

নইলে প্রতিবেশী ধীরেন বাবুদের কাণ খাড়া খাঁটি দেশী কুকুরের ঔরসে প্রাণেশ্বরদের আস্তাকুঁড়-চাটা রূপীর গর্ভে প্রাণেশ্বরের প্রাণের চেয়ে প্রিয় টাইগারের জন্ম সম্ভব হত?

ধীরেনবাবুদের কুকুরটাই যে টাইগারের বাপ তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করারও উপায় নেই।

টাইগারের কাণ ঝোলা। বড় হয়ে গলার আওয়াজ হয়েছে অনেকটা গ্রে হাউণ্ডের মত।

ধীরেনবাবু ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারে নি, শুধু জানিয়েছিল যে টাইগারের দিদিমার দাদামশায় ছিল সত্যিকারের গ্রে হাউণ্ড।

ধীরেনবাবুর ঠাকুর্দার জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ব্যাপারটা তাই পারিবারিক স্মৃতিকথা হয়ে আছে।

ঠাকুর্দা চাকরী করত বড় সাহেবের ফার্মে—তখনকার দিনের হিসাবে মোটা বেতনের মস্ত চাকরী।

সায়েব কয়েকদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিল—সেই ফাঁকে সায়েবের চাপরাশীকে একটা টাকা ঘুষ দিয়ে সায়েবের পেয়ারের গ্রে হাউণ্ডটার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিয়েছিল নিজের পেয়ারের দেশী কুকুরটার।

সায়েব কি করে জেনেছিল কে জানে, একদিনে বরখাস্ত করে দিয়েছিল ধীরেনের ঠাকুর্দা আর চাপরাশীটাকে।

চাকরীটা থাকলে ঠাকুর্দা যা রেখে যেতে পারত তাই নাকি তার নাতিরা

ভোগ করে শেষ করতে পারত না। চাকরী যাবার তিন বছরের মধ্যে ঠাকুর্দা মারা গেল রাজ যক্ষ্মায়।

ধীরেনবাবুর বাবাকে নিতে হল কেরাণীগিরি, তার পাঁচ ছেলের মধ্যে দু'জনকে আজ কেরাণীগিরি করে সংসার চালাতে হচ্ছে।

সত্যি, ইন্দ্রানীর কী মুখশ্রী, কী গড়ণ, বাড়ন্ত সংহত রূপযৌবনের কি আশ্চর্য বিকাশ।

খাঁটি মাখনের মত কী কোমলতাই ক্রমে ক্রমে রূপায়িত হয় তার মাংস ও চামড়ায়, পদ্মের পাঁপড়ির সঙ্গে যেন পাল্লা দেয় তার দুটি চোখ, বীর অর্জুনের বৃহন্নলার দশা পাওয়ার মতই যেন নৃত্য আর ছন্দের ভঙ্গিতে গড়ে ওঠে তার সর্বাঙ্গ—দৈহিকভাবে সে যেন হয়ে ওঠে সেরা সেরা সিনেমা ষ্টারদের জীবন্ত ঘরোয়া প্রতীক।

কিন্তু কী নীরস কাটখোট্টা বিশ্রী মেজাজ যে তার হয়েছে।

কে কেমন হবে বুঝেই কি মণিমালা নাম রাখার ম্যাজিক জানে? লাগসই নাম?

নিজের নাম নিয়ে বিব্রত লজ্জিত প্রাণেশ্বর মাঝে মাঝে তাই ভাবে।

দেবরাজের রাণীর মত সুন্দরী আর অহঙ্কারী হবে জেনেই কি সে মেয়ের নাম রেখেছিল ইন্দ্রানী?

মেয়ের নাম রাখার আগে মা-খেকো ভাইটার নামও সে-ই রেখেছিল—চপল। ওটা ভাল নাম—আসল নাম। 'রাক্ষস' বলে ডেকে ডেকে সে-ই ওর ঘরোয়া ডাক নাম দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, রাখু!

চপল? ছেলেবেলা থেকেই চপল সত্যই চপল। হরেক রকম বেবী ফুড খাইয়ে বাপের হাতে মানুষ করা ছেলে বেশ মোটাসোটা হয়ে বড় হলেও কেমন যেন খাপছাড়া ধাত হয়ে যায়। কারণে অকারণে হাসে কাঁদে আর বেশী রকম রাগ হলে একেবারে মূর্চ্ছা যায়।

মণিমালা মেয়ে বিয়োতে এসে থেকে প্রায় মায়ের মতই করেছে তার জন্য,

হাসপাতালে ইন্দ্রানীকে বিইয়ে আসার হাঙ্গামা সামলাবার পর মেয়ের সঙ্গে ছেলের মতই মানুষ করে এসেছে ভাইকে।

চপল কিন্তু চপল হয়েই উঠেছে দিনকে দিন।

বড় হতে হতে সে যেন ক্রমে ক্রমে বাইরেকে চিনতে শিখেছে আপন বলে।

প্রথমে পাড়ায় এবাড়াতে ওবাড়ীতে সমবয়সীদের সাথে খেলে আর ঝগড়া করে দিন কাটাত। ক্রমে ক্রমে পড়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বাড়তে লাগল তার খেলা ঝগড়া মারামারির সীমা।

স্কুলে উঁচু ক্লাসে উঠতে উঠতে কিন্তু একেবারে বদল হয়ে গিয়েছিল তার ওই ধরণের চপলতা।

মণিমালা আপশোষ করে বলত, ভাবলাম, এবার বুঝি ঘরের টান হবে। একা বাবা যে মা হয়ে বাপ হয়ে এত করেছে সেটা একটু খেয়াল হবে।

প্রাণেশ্বর চপলের দিক টেনে বলত, কেন, পরীক্ষায় তো খারাপ করে না? চালাক চতুর তো কম নয়? ছেলেরা ওকে খুব মানে। আমায় সেদিন বাঁচিয়ে দিল না?

: বাঁচিয়ে দিল মানে?

: তুমি জানো না মণি-মা। আমাদের পাড়ায় কয়েকটা ছেলে একটা দল করেছিল। কিসের দল শুনে তোমার দরকার নেই। আমি দলে যাব না বলে রেগে বাড়ীর কাছেই ঘোরাফিরা করছিল, বাড়ী থেকে বেরোলেই মেরে লাশ করে দেবে।—দুদিন আসি নি বলে তুমিই চপলকে খবর জানতে পাঠিয়েছিলে। ব্যাপার শুনে চপল বলল, দাঁড়া, আমি আসছি। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে বলল, চ', দেখি কোন শালা তোর কি করতে পারে।

: কোন শালা! ছি ছি! কি কথাবার্তাই হয়েছে চপলের!

: শোনই না। আমি বললাম, ওরা কিন্তু দলে ভারি—দু'জনকে পিষে দেবে। চপল কি বলল জানো মণিমা?—আয় না, অত কেন প্রাণের ভয় করিস। গলির মাঝখানেই সাত আটজন আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো—

কি হম্বিতম্বিই করতে লাগল। এমন ভয় হয়েছিল মণিমা, কি বলব তোমায়। ওমা, তারপর দেখি কি, প্রায় ত্রিশজন ওদের ঘিরে ফেলেছে। কুড়ি বাইশজন ছাত্র হবে, বাকী সব যোয়ান মদ্দ মানুষ। জানো মণিমা, আমার কাছে জোড় হাতে ক্ষমা চেয়ে নিজেদের কাণ মলে বজ্জাতগুলো সেদিন রেহাই পেয়েছিল।

: কিন্তু এরকম টই টই হৈ চৈ না করে' একটু পড়াশোনা করলে চপল যে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হতে পারত? এই সব করে বেড়াবে, আবার পড়া ফেলে কবিতাও লিখবে।

প্রাণেশ্বর তাকে কি বলে ডাকবে নিজের সেই নামটাও মণিমালা ঠিক করে দিয়েছিল।

সরলা তাকে শেখাতে গিয়েছিল, ওকে ছোট-মা বলে ডাকবি, বুঝলি?

মণিমালা শুনতে পেয়ে বলেছিল, না না, ছোট-মা নয়। আপনাকে আমি মাসীমা বলব, ও আমাকে ছোট-মা বলবে—সে ভারি বিশ্রী হবে। আপনাকে গোড়া থেকে দিদি বললে বরং ওটা চলতে পারত। ও আমাকে মণি-মা বলে ডাকবে।

মণি-মা! কী সুন্দর নাম!

বড়দের কথা শুনতে শুনতে ছেলেমানুষ প্রাণেশ্বরের প্রাণেও প্রশ্ন জাগত—সত্যিই তো, মণিমা কেন শ্বশুরবাড়ী যায় না?

একটু বড় হয়ে একদিন সে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিল, মণি-মা, তুমি বুঝি চপলকে আর দাদুকে দেখার জন্য এখানে থাকো?

মণিমালা আঙ্গুল উঁচিয়ে বলেছিল, আবার চপল বলছিস? কতবার না বুঝিয়ে বলেছি তোর মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধরলে ও তোর দাদা হয় আর আমার সঙ্গে তোর সম্পর্ক ধরলে মামা হয়? তুই তোকারি তোরা করবিই—মামা দাদা চলবে না জানি। ওকে দামা বলবি—

সহজে আসল কথা ভুলবার ছেলে প্রাণেশ্বর কোনদিন ছিল না, সে বলতে যায়, আচ্ছা তাই বলব। মণিমা তুমি কেন—

মণিমালা আবার আঙুল উঁচিয়ে শাসনের সুরে বলেছিল, এতবার শেখালাম, একজনের কথা শেষ না হতেই আবার মুখ খুলছিস্? তুই তো বড় অসভ্য ছেলে প্রাণেশ! শেষ পর্যন্ত শুনবি তো আমি কি বলছি? তুই যাতে ওকে সহজে দামা বলে ডাকতে পারিস সেজন্য নতুন করে আমি ওর ডাক নাম রেখেছি দামা। সবাইকে বলে দিয়েছি এবার থেকে ওকে দামা বলে ডাকতে হবে।

প্রাণেশ্বরকে কাছে টেনে একহাতে গায়ের সঙ্গে আলগাভাবে জড়িয়ে রেখে গালভরা হাসি হেসে মণিমালা বলেছিল, ও তো সত্যি চপল নয়—দামাল। বেশ মানানসই হবে না রে দামা ডাক নামটা?

মামীরা আদরে আদরে নিস্‌পিস্ করে দেয় বলে প্রাণেশ্বর মামাবাড়ী যাওয়া বর্জন করেছে—সরলার কাছে এ গল্প শোনার পর প্রাণেশ্বরকে দু'হাতে বুকে টেনে আদর করার সাধ মণিমালা ত্যাগ করেছিল।

এ রকম প্রকৃতির ছেলেমেয়ে থাকে। ঘাঁটাঘাঁটি করা আদর একেবারে সইতে পারে না।

চপলের মত না হোক, প্রাণেশ্বরও অন্যভাবে দামাল ছেলে। মণিমালার এত কথা, সংযত সুন্দর আদর আর মুখভরা এমন হাসি, কিছুই তাকে আসল প্রশ্ন ভুলিয়ে দিতে পারে নি।

আবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিল, মণিমা, তুমি শ্বশুরবাড়ী যাও না কেন?

মণিমালা হতবাক হয়ে থেকেছিল খানিকক্ষণ।

: শ্বশুরবাড়ী যাই না কেন? বললে তুই বুঝতে পারবি পাগলা? বড় হ', তখন শুনিস্।

: বুঝতে পারব না কেন? আমি বোকা নাকি? আমি সব জানি বুঝি মণিমা। মেজদিকে খালি বকে মারে কষ্ট দেয় বলে মেজদি শ্বশুরবাড়ী যায় না। তোমাকেও বুঝি কষ্ট দেয়?

: বললাম না বড় না হয়ে তুই বুঝবি নে? বকা আর মারাই কি মানুষকে কষ্ট দেবার একমাত্র উপায় রে পাগল? আরও কতভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে পাগল করে মেরে ফেলা যায় তুই তার কি বুঝবি!

প্রাণেশ্বর কদাচিৎ যা করে সেদিন তাই করেছিল। মণিমালার গলা জড়িয়ে তার গালে গাল রেখে কাণে কাণে বলেছিল, তোমায় কষ্ট দেয়, না? তাই তুমি যাও না। দাঁড়াও না, বড় হই, তোমায় কষ্ট দেবার মজা ওদের টের পাইয়ে দেব!

প্রাণেশ্বরকে কতগুলি চুমো খেয়েছিল মণিমালা? বুকে জড়িয়ে জড়িয়ে চুমো খেয়ে আদরের চোটে মামীমা নিসপিস করে দেয় বলে প্রাণেশ্বর যে মামা বাড়ী যায় না, সে সব হিসাব ভুলে গিয়ে প্রাণপণে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একবার তার মাথাটা গালে চেপে, একবার তার গালে কপালে মুখে অজস্র চুমো খেতে শুরু করলে। বেশ খানিকক্ষণ তার আদর উপভোগ করে প্রাণেশ্বর খিলখিল করে হেসে উঠেছিল!

যত বয়স বাড়ে নিজের নামটা প্রাণেশ্বর তত বেশী অপছন্দ করে।

রীতিমত লজ্জা বোধ করে। কি বিশ্রী সেকেলে নাম!

বন্ধুরা পরিহাস করে নাকিসুরে মেয়েলি গলায় ভঙ্গি করে তার নাম ধরে ডাকে যখন তখন।

প্রাণেশ্বর মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখে, দেখাবার চেষ্টা করে যে সে কিছুমাত্র লজ্জিত বা বিব্রত হয় নি—তামাসাটা সেও উপভোগ করছে। কিন্তু কাণ লাল হয়ে গেলে সেটা তো আর ঢাকা যায় না!

সাবালক হয়েও নামটা বদল করা সম্ভব হয় নি।

বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলেই নামটা পাল্টে নেবার সহজ উপায়টাও প্রাণেশ্বর কাজে লাগাতে পারে না। ওদের ঠাট্টা তামাসার ঘায়ে কাতর হয়ে একেবারে নামটা পাল্টে ফেলল! এ অপমান সহ্য করা যায় না। তা ছাড়া নাম বদলালে যাদের সঙ্গে নতুন পরিচয় হবে তারাই কেবল নতুন নামটাকে স্বীকৃতি দেবে—এতকাল যারা প্রাণেশ বলেছে তারা ওই নাম ধরেই ডাকবে!

সেদিন ছিল ছুটি।

কলেজে ছাত্রদের একটা মিটিং ছিল। বড়ই সাংঘাতিক মিটিং।

জগতের নওজোয়ানরা যুদ্ধ চায় কি চায় না।

এসব ব্যাপারে প্রাণেশ্বরের কাছ থেকে তেমন যেন সাড়া মেলে না। বাইরে থেকে মনে হয় তার যেন কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। কিন্তু তার মনে যে কত চিন্তা আর ভাবের তরঙ্গ ওঠে টের পেলে বন্ধুরা তাজ্জব বনে যেত।

চপল কিছু কিছু জানে। একমাত্র তার কাছেই প্রাণেশ্বর মাঝে মাঝে এসব বিষয়ে তার উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা প্রকাশ পেতে দেয়।

বলে, সব চেয়ে কি আশ্চর্য লাগে জানিস? পৃথিবী জুড়ে ছেলেরা এক সুরে একভাবে সাড়া তুলেছে। শুধু শ্লোগান নয়, তা'হলে তো ব্যাপারটার মানে সহজ হয়ে যেত। মন থেকে প্রাণ থেকে এক সুরে আওয়াজ তুলছে— ভাষাটার শুধু তফাৎ।

: এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? শান্তি আজ সারা পৃথিবীর ব্যাপার, সব দেশের ব্যাপার। আন্দোলন থেকে সকলের ভাবনা চিন্তাও একরকম হয়ে গেছে।

: সে তো গেছে। আসল মানেটা বুঝিস? দেশ বিদেশে কত তফাৎ— সব বিষয়ে। এখানে যখন দিন, আরেক দেশে তখন রাত। সেদিন হোটেলে গোস্ত খেলাম—বেরিয়ে খানিক পরে বমি করে ফেললাম। অন্য দেশে গরু শূয়োরের মাংস মেলে না বলে আমার মত ছেলেরাই রেগে টং হয়ে চেঁচামেচি করছে। আন্দোলন এক হোক—দেশ বিদেশে সেটার সুর তো নানারকম হবে, রূপ তো ভিন্ন রকম হবে?

: তা হচ্ছে না ? শান্তির জন্য আমরা কলেজে যে মিটিং করব, পিকিং মস্কো লণ্ডন ওয়াশিংটনের কলেজের ছেলেদের মিটিং একরকম হবে ?

: বাইরের চেহারাটা একরকম হবে না, আসল সুরটা মিলে যাবে। পরে এটা কি দাঁড়াবে ভেবেছিস কখনো ? চপল গালে হাত দিয়ে বলে, ও বাবা, তুই দেখি গভীর থেকে গভীরতরে যাচ্ছিস দিন কে দিন !

ইন্দ্রাণী বাথরুম থেকে স্নান সেরে ফিরছিল। গায়ে শুধু পুরানো হাল্কা একটা শাড়ী। ঘরে গিয়ে বেশ করবে, প্রসাধন সারবে।

তার দিকে চেয়ে প্রাণেশ্বরকে তন্ময় হয়ে যেতে দেখে চপল বড়ই অস্বস্তি বোধ করে।

সে অবশ্য কল্পনাও করতে পারে না যে স্নান-ঘর থেকে পুরানো পাতলা শাড়ী আল্‌তোভাবে গায়ে জড়িয়ে ইন্দ্রাণীকে ঘরে ফিরতে দেখে প্রাণেশ্বরের মনে পড়েছে বাড়িতে বোনেদের এবং পাড়াতে মেয়ে বৌদের স্নান সেরে গামছা পরে ঘরে যাওয়ার ছবি, শুধু বাড়ির মধ্যে নয়, বাইরে প্রকাশ্য স্থানেও !

মিটিং নটায়। চপলের সঙ্গে একটু আলাপ আলোচনা করার জন্য সাড়ে সাতটার সময় ওদের বাড়ি গিয়ে প্রাণেশ্বর শুনতে পায়, চপল বাড়ি ছেড়েছে সাড়ে ছটায়।

মণিমালা ঝাঁঝের সুরে বলে, চপলের কথা আর বলিস না। কতবার বললাম নটায় তোর মিটিং, ঢের সময় আছে, মেয়েটাকে নাচের স্কুলে পৌছে দিয়ে মিটিং-এ যাস। জেগে দেখি নিজেই গুঁড়ো দুধের এক কাপ চা বানিয়ে খেয়ে ভেগেছে। তোকে কিন্তু ইন্দ্রাণীকে নাচের স্কুলে পৌছে দিতে হবে।

: আমিও যে মিটিং-এ যাব ভাবছিলাম মণি-মা ?

: দায় সেরে মিটিং-এ যা। দায় এড়িয়ে মিটিং-এ যাবার মানে হয় ? মিটিং মিটিং করে তোরা পাগল হয়েছিস। দায় নেই ? কাজ নেই ? সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু মিটিং ? ইন্দ্রাণীকে তুই যদি আজ নাচের স্কুলে না পৌছে দিস প্রাণেশ, তোর সঙ্গে আমার—

: দেব দেব—নাচের স্কুলে পৌছে দেব।

ইন্দ্রাণীকে নাচের স্কুলে পৌঁছে দিতে গিয়ে মৃদুলার সঙ্গে প্রাণেশ্বরের পরিচয় হয় এবং নিজের নামটা নিয়ে তার কাছ থেকেই বোধহয় সব চেয়ে বেশী লজ্জা পায়।

ছেলেবেলা থেকেই ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে তার সর্বদা যাতায়াত। তার প্রাণটা বাঁচিয়েছিল মণিমালার এই অহঙ্কার। সরলা যেচে যেচে আরও ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে তুলেছিল বলেই শুধু নয়, প্রাণেশ্বরকে সত্যই সে গভীরভাবে স্নেহ করে, দুচার দিন সে না গেলেই উতলা হয়ে ডেকে পাঠায়, অনুযোগ আর গঞ্জনা দেয়।

ইন্দ্রাণীর জন্মের বছর খানেকের মধ্যে তার আবার সন্তান সম্ভাবনার দুর্ভাগ্য ঘটেছিল। হাসপাতালে গিয়েই বিইয়েছিল একটি টুকটুকে ছেলে।

ছেলেটি হাসপাতালেই মারা গিয়েছিল ধনুষ্টঙ্কার রোগে।

তারপর আর তার ছেলে মেয়ে হয় নি। হত নিশ্চয়—সমর তাকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেছে।

মণিমালার মন যুগিয়ে একটা মেয়েকে মানুষ করাই নাকি তার পক্ষে কঠিন কাজ। আর দায় বাড়িয়ে কাজ নেই।

মণিমালা বলেছিল, বেশ তো, বেশ তো, আমিও তো তাই চাই! তোমার পায়ে শত শত প্রণাম!

সমর রাগের ভাব দেখিয়ে বলেছিল, এভাবে নিলে কিন্তু হবে না। এটা তোমার আমার মিলে মিশে জেনে শুনে করার ব্যাপার। এই নিয়ে তোমার কোন মানসিক বিকার দেখা দিলে আমার পক্ষে সেটা কম মারাত্মক হবে না।

মণিমালা রেগে টং হয়ে বলেছিল, ফাঁকা কথা বাড়াও কেন? আরও দুএকটা ছেলেমেয়ে চাইলে আমি তোমায় জানাব না—আমায় কি সে রকম সেকেলে মেয়ে পেয়েছো?

ছেলেবেলা থেকে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে খেলা করেছে, বড় হয়েও তার সঙ্গে মিলছে মিশছে কিন্তু বড় হয়ে তাকে সাথে নিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে প্রাণেশ্বরের বিষম আপত্তি দেখা যায়।

: কেন রে প্রাণেশ ?

: সবাই এমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

মণিমালা বলে, তোর বুঝি হিংসে হয় ?

প্রাণেশ্বর বলেছিল, আমি কি মেয়ে যে হিংসা হবে ?

সমর হেসে বলে, তুমি যে উল্টো গাইছ হে প্রাণেশ। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে এমন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গী হিসাবে তোমার তো গর্ব বোধ করা উচিত।

প্রাণেশ্বরও হাসিমুখেই বলে, তা হয় তো করতাম কিন্তু দানিটার বড় বিশ্রী স্বভাব। নিজেরও ওর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা চাই সবাই ওকে দেখছে কি না।

সমর বলে, সে তো স্বাভাবিক প্রাণেশ। প্রকৃতির নিয়মে যা ঘটবেই তাতে বিরক্ত হতে নেই। এমন রূপ পেয়েছে, ওর মনে একটু অহঙ্কার হবে না এই বয়সে ? পরে হয় তো বুঝতে পারবে ছাঁকা রূপের আসল দাম কত—কিন্তু সে হ'ল পরের কথা।

মণিমালা বলে, বিশ্রী লাগুক, তুই বাছা ওকে নাচের ক্লাসটা ঘুরিয়ে আন। এত নাম করা মাস্টার, দেশ বিদেশ ঘুরে কত টাকা কামিয়েছে—ক্লাস খুলেছে একটা এঁধো গলির মধ্যে। চার পাঁচটা বখাটে ছোঁড়া সেদিন দানিকে আটক করেছিল জানিস ?

: আটক করেছিল ?

: আটক মানে গলিটার মধ্যে পথ আটকে আলাপ করার চেষ্টা করেছিল। সে ভয় আমি করি না, হোক এঁধো গলি, ভদ্র পাড়ার গলি তো, বাড়িতে বাড়িতে ভদ্র পরিবার বাস করে তো। ভয় আমার মেয়েটার মেজাজের জন্য। জানিস তো কি রকম উগ্রচণ্ডা ? সেদিন নাকি খুব ভদ্রভাবে নম্রভাবে ওদের কোন এক সভায় একটু নাচ গান করে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিল। মেয়ে বলেছিল কি জানিস প্রাণেশ ?—ওর কথা শুনেই ভড়কে গেলাম, নইলে চড় মেরে গাল ফাটিয়ে দিতাম না !

সমর বলে, মেয়ের খালি নিন্দাই কোরো না, একটুও ভড়কে না গিয়ে মেয়ে কি রকম লাগসই জবাবটা দিয়েছিল তাও বলো প্রাণেশকে। জানি বলেছিল, চেনা লোকের পরিচয়পত্র নিয়ে বাড়ি যাবেন, নয় তো শঙ্কর বাবুকে বলবেন। আসুন না আমার সঙ্গে? শঙ্কর বাবু বললে নিশ্চয় আপনাদের সভায় যাব।

প্রাণেশ্বর বলে, বুঝেছি ব্যাপারটা। তাহলে নিয়েই যাই, নাচের ক্লাসে পৌছে দিয়ে আসি।

আজ আর ইন্দ্রাণী বাসে উঠে সারা পথ কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করে না যে কতজন হাঁ করে আর কতজন আড় চোখে তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে।

প্রাণেশ্বরের সঙ্গে মশগুল হয়ে কথা বলে। সব তার নিজের কথা। ভাল করে নাচ শিখে, বাছা বাছা কয়েকটি মেয়েকে নাচ শিখিয়ে সে ইউরোপ আমেরিকা জয় করতে যাবে।

শুধু তারা মেয়েরা যাবে। পুরুষ সঙ্গী একজনও নেবে না।

: নিজে নাচ শিখে, বাছা বাছা মেয়েকে শিখিয়ে তারপর যাবে? তোমার সঙ্গে যারা নাচ শিখছে তাদের নিয়ে গেলে সহজ হয় না?

: ওরা কেউ মানবে আমাকে? যেমন যেমন নাচ দেখাতে চাইব, দেখাতে রাজী হবে? শুধু গোলমাল করবে যে এরকম নয় ওরকম নয়, এটা করলে ভাল হয়, ওটা করলে ভাল হয়। দু'একজন ছাড়া কেউ নাচতেও কি জানে! বেশীর ভাগ কারা নাচ শিখতে আসে জানো? নাচ যাদের ধাতেই নেই, মরে গেলেও কোনদিন যারা নাচতে পারবে না।

এঁধো গলিই বটে।

দেশ বিদেশে এত নাম করা নাচুয়ে শঙ্কর দাস এই গলির মধ্যে তার নাম করা নাচের স্কুল খুলেছে? আর জায়গা পেল না?

ইন্দ্রানী বলে, ওর নিজের বাড়ি। শহরটা পত্তন হওয়ার সময় বোধ হয় তৈরী হয়েছিল বাড়িটা। এইটুকু গলি দেখে ভাবছ বুঝি বাড়িতে ওর জায়গা নেই ? মস্ত বড় উঠান ছিল, সেইখানে শেড তুলে নাচের ক্লাশ করেছেন।

আঁকা বাঁকা গলি। মিনিট দুই চলার পর একটা দোতলা বাড়ির সামনের হাত খানেক চওড়া রোয়াকে পাঁচটি যুবককে বসে থাকতে দেখা যায়। প্রাণেশ্বরের সঙ্গে ইন্দ্রানীকে আসতে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেও তারা চুপচাপ বসেই থাকে।

গলির পরের পাকটা ঘুরে প্রণেশ্বর জিজ্ঞাসা করে, ওরাই না ?

ইন্দ্রাণী বলে, হ্যাঁ।

শঙ্কর দাসের বাড়িটা জীর্ণ পুরাতন, দেখলেই টের পাওয়া যায় যে-কোন দিন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে পারে। বাড়িটা বোধহয় দু'তিন কাঠায়, উঠোনটা বিঘে খানেক হবে।

নাচের ক্লাশের শেডটি একেলে, নতুন এবং মজবুত।

নানা বয়সের পনের যোলটি মেয়ে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিল, একজন দু'জন করে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

ইন্দ্রাণী বলে, দেখে তাক লাগছে ? ভাবতে পেরেছিলে যে ছত্রিশজন মেয়ে এখানে নাচ শেখে ?

আমি ওসব কিছু ভাবিই নি !

একজনের সঙ্গে আলাপ করবে প্রাণেশদা ? নাচ শেখার জন্য নাচ শিখতে আসে নি এমন এক জনের সঙ্গে ? হাতীর মত মোটা মেয়ে নেচে নেচে রোগা হতে চায়।

মৃদুলা সত্যই মোটা। এই বয়সে এমন ভাবে মুটিয়েছে দেখলে সত্যি কষ্ট হয়। পরিচয় হওয়ামাত্র মৃদুলার মন্তব্যে কিন্তু কষ্ট উপে যায়।

মৃদুলা একটু হেসে বলে, আপনি তো ভারি চালাক লোক, মেয়েদের প্রাণেশ্বর হবার বেশ সহজ কায়দা বাগিয়ে রেখেছেন। যেরকম চালাক সেরকম ডেঞ্জারাস নন তো ?

ইন্দ্রাণী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

প্রাণেশ্বর বুঝতে পারে যে নাম নিয়ে তামাসা করে তার মুখের ভাব দেখে মৃদুলা আশ্চর্য হয়ে গেছে।

মৃদুলার বিস্ময় লক্ষ্য করে চেষ্টা করে নিজেকে সামলে খানিকটা হাল্কা সুরেই বলে, নামটা রেখেছিলেন বাবা। আপনাদের অসুবিধা কি? নামের সঙ্গে বাবু কথাটা যোগ করে বলবেন তো! প্রাণেশ্বরবাবু বললে দোষ কেটে যাবে।

: আপনি মোটেই বাবু নন। তাছাড়া—

মৃদুলা মিষ্টি করে হেসেছিল।

: আমার বৌদি দাদাকে কি বলে ডাকে জানেন? বাবু বলে ডাকে। এদিকে প্রাণেশ্বর, তার সঙ্গে আবার বাবু—ওরে বাবা, প্রাণেশ্বরবাবু কিছুতেই বলতে পারব না।

: প্রাণেশদা বললে হয় না?

: দা দা করার ছ্যাবলামি ভাল লাগে না। শুধু নামটা বললে আপত্তি আছে, প্রাণেশ বললে?

: ক'মিনিটের চেনাতেই বলতে পারবেন কি?

: কেন পারব না? দেখবেন? প্রাণেশ, তুমি এসে থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার জন্য আমিও বসতে পারছি না। বেঞ্চি চেয়ার রয়েছে, একটাতে বসলে হত না প্রাণেশ?

প্রায় ধাঁধাঁ লেগে যায়। কিন্তু খারাপ লাগে না।

বেঞ্চে বসে তারা কথা বলে। প্রাণেশ্বর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে যে এত মেয়ের মধ্যে একমাত্র মৃদুলা ছাড়া আর কারো সঙ্গে যেন ইন্দ্রাণীর তেমন ভাব নেই। দু'একজনের সঙ্গে ভদ্রতার দু'চারটে কথা ও একটু হাসির বিনিময় হয়—তার বেশী আলাপ আর এগোয় না। অনেক মেয়ে যেন ইচ্ছা করেই ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরেও তাকায় না।

ইন্দ্রাণীর অহঙ্কার অথবা মেয়েদের হিংসা?

কিছু মেয়ে একলাই এসেছে, কয়েকজনের সঙ্গে এসেছে ছোট ছেলে, পুরুষ অভিভাবক মোটে জন পাঁচেক। ইন্দ্রাণীর সম্পর্কে ওদেরও যেন কিরকম উদাসীন বিরূপ ভাব।

প্রাণেশ ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করে, এর সঙ্গে তোর কি আগে থেকে আলাপ ছিল নাকি ?

: না, এখানেই আলাপ।

মৃদুলা বলে, চেহারার জন্য ওকে সবাই হিংসা করে, মোটা বলে আমায় নিয়ে করে হাসাহাসি। প্রথম থেকে আমাদের তাই মিল হয়েছে। ইন্দ্রাণীর পাশে এই মুটকির নাচ দেখে হাসতে পাবে না কিন্তু প্রাণেশ।

: পুরুষদের নাচ দেখতে দেয় ?

: মেয়েদের সঙ্গে এলে দেখতে দেয়। প্রথমে কয়েকটি মেয়ে আপত্তি করেছিল। শঙ্করবাবু বলেছিলেন—দশজনকে দেখাবার জন্যেই তো নাচ শেখা, ঘরের কোণায় লুকিয়ে যে নাচ হয় আমি তা শেখাতে জানি না। সবাইকে যে নাচ দেখাবে, কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুকে সে নাচ দেখালে দোষ কি ?

নাচ শেখানো শুরু হলে প্রাণেশ্বর ভাববার সময় পায় অনেকক্ষণ। ওই সময়ের মধ্যেই মৃদুলার পরিচয় করার রকমে ধাঁধাঁ লেগে যাবার কারণটা সে আবিষ্কার করতে পারে।

তাই বটে, ঠিক। ছেলেবেলা থেকে কত উপন্যাসে যে নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা আর পরিচয় ঘটানো নিয়ে কত ফ্যাচাং আর ভজঘটের সঙ্গেই তার পরিচয় ঘটেছে !

শুধু মার্জিত শিক্ষিত আধুনিক নায়ক নায়িকার বেলাতেই নয়, একেবারে গেঁয়ো থেকে সাধারণ ঘরের নায়ক নায়িকাদের বেলাতেও।

বাড়িতে ইন্দ্রাণীর নাচ প্রাণেশ্বর অনেক দেখেছে, আজ অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাচ শেখা দেখতে দেখতে সে যেন আবার নতুন করে তার আশ্চর্য গড়ন আর স্বাভাবিক প্রতিভার দিকটা আবিষ্কার করে। শিখতে শিখতে

একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে ইন্দ্রাণী, কত সহজ স্বচ্ছন্দভাবে সে আয়ত্ত করে নিচ্ছে শঙ্করের শেখানো জটিল ও কঠিন মুদ্রা ও ভঙ্গিগুলি!

অন্য মেয়েদের ঈর্ষা জাগবে সেটা আর আশ্চর্য কি?

মুটকি মৃদুলার নাচ মোটেই হাস্যকর হয় না। কারণ সেরকম সুন্দর মনোহর রোমাঞ্চকর নাচ সে নাচে না। শঙ্করকে তার বলাই আছে। যে সব সহজ নাচে অঙ্গসঞ্চালন বেশী দরকার হয় সে সব নাচই সে শেখে।

ইন্দ্রাণী দম নিতে পাশে এসে বসে বলে, চেয়ে ত্যাখ, ক'জন তো সোজা নাচটা শিখছে—মৃদুলাকেই বরং সব চেয়ে কম খারাপ দেখাচ্ছে। ওর তবু তাল জ্ঞান আছে। ওদিকের মেয়েটা তো বেশ সুন্দর দেখতে, কিরকম পা ফেলছে ত্যাখো। নাচ তোর আসবে না, তোর ধাতেই ওটা নেই, তবু নাচ শেখা চাই।

: চেষ্টা করছে।

: কি দরকার যা হবে না তাই নিয়ে মিছে চেষ্টা করে? অন্য কিছু শেখার চেষ্টা করলেই হয়!

একটু থেমে ঝাঁঝের সঙ্গে সে যোগ দেয়, শঙ্করবাবুরও এমন টাকার লোভ, যে আসবে তাকেই ভর্তি করে নেবে।

প্রাণেশ্বর আচমকা জিজ্ঞেস করে, এত মেয়ের মধ্যে মৃদুলাকে তোর এত ভাল লাগল কেন?

ইন্দ্রাণী বলে, মেয়েটা ভাল বলেই ভাল লাগল। আমায় কি রকম ভালবাসে তুমি ভাবতে পারবে না। আড়ালে পেলেই ছ'টা পারে চুমো খায়। তাই ভাল লাগল। না, কোন প্যাঁচ নেই, ন্যাকামি নেই—দেখলে না তোমার সঙ্গে কিরকম সহজভাবে আলাপ করল?

ফিরবার সময় দেখা যায় সেই ছেলে ক'জন সেই ছোট রোয়াকে বসে আছে।

এবার তাদের অদ্ভুত রকম তাজা ভাব।

ইন্দ্রাণী আর প্রণেশ্বরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা কি বিশ্রী কথাবার্তাই যে শুরু করে দেয়।

কথা বলার আইন-সঙ্গত অধিকার নিয়ে তারা যেন রোয়াকে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নিজেদের মধ্যে যা খুশি বলাবলি করার স্বাধীনতা অর্জন করছে।

ইন্দ্রানী বলে, লপেটা খুলে দু'এক ঘা কষিয়ে দেব ?

: ছ্যাবলামি করিস না দানি।

গলির মোড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে প্রাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করে, পয়সা কড়ি সঙ্গে কিছু আছে ?

ইন্দ্রাণী উৎফুল্ল হয়ে বলে, রেঁস্তোরায় যাবে তো ? আছে, সাত আট টাকার মত আছে।

প্রাণেশ্বর বলে, বাসের পয়সা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

ইন্দ্রাণীর মুখে মেঘ ঘনিয়ে এলেও তাকে বাসে তুলে দিয়ে বলে, বাড়ি যাও, আমি একটা কাজ সেরে আসছি।

বেলা দুপুর মানে যখন দুটো বেজে যায়, তখনও বাড়ি ফেরে না প্রাণেশ্বর। বাড়িতে না ফিরে কলেজেই গেছে নিশ্চয়। কিন্তু এমনভাবে না জানিয়ে যাওয়াটা কি ভাল ?

তার জন্য কেউ অবশ্য উপোস দিয়ে নেই।

সবাই খেয়েছে যথা সময়ে।

আমিষ ঘরের বেশীর ভাগ রান্না সেরে জগদম্বা কোন দিন আস্ত দু'একটা আলু বেগুণ কাঁচকলা দিয়ে দু'মুঠো আলোচাল সিদ্ধ করে নেয় নিরামিষ আলাদা উনানটা জ্বালিয়ে।

বড় সংসারের বড় উনানে কত কয়লা যে পোড়ে। সরলা আসল রান্না শেষ হলেই খুচিয়ে ঝরিয়ে নিভিয়ে দেয় বড় উনানটা।

ছাই থেকে পোড়া কয়লা বাছতে হবে।

এ দুর্দিনে নইলে কি সামলানো যায় ?

প্রাণেশ্বর সকালে মণিমালাদের বাড়ি গিয়েছিল, এটা জানাই ছিল। ওখানেই নাওয়া খাওয়া সেরে কলেজ চলে গেছে নিশ্চয়।

কিন্তু বাড়িতে একবার উঁকি দিয়ে সকলকে নিশ্চিন্ত না করে এভাবে কলেজে চলে যাওয়া তো রীতি নয় প্রাণেশ্বরের। কোনদিন কটায় শুরু হয়ে কটা পর্যন্ত ছেলের ক্লাস হয় তাও সরলার মুখস্ত।

সরলাকে না জানিয়ে কোন কারণে কলেজে যদি গিয়েও থাকে, বেলা ছুটোর মধ্যে আজ তার বাড়ি ফেরার কথা।

বেলা পড়ে এলে শম্ভুকে মণিমালাদের বাড়ি খবর জানতে পাঠান হয়। শম্ভুর সঙ্গে ব্যস্তভাবে খবর জানতে আসে মণিমালা আর ইন্দ্রাণী দুজনেই।

ইন্দ্রাণী বলে, এখনো ফেরেনি প্রাণেশদা? নিজে এলো না, আমায় বাসে তুলে দিয়ে বলল, একটু কাজ সেরে আসছি। কেমন যেন মনে হয়েছিল প্রাণেশদার ভাব সাব।

খানিকক্ষণ আনমনে থেকে মণিমালার মুখের দিকে চেয়ে ইন্দ্রাণী আবার বলে, নিশ্চয় সেই ছোঁড়াগুলির সঙ্গে মারামারি করেছে। আমি এমনি জুতো কষিয়ে দেবার কথা বলেছিলাম—সত্যি কি আর কষাতে যেতাম? প্রাণেশদা সেটা বোঝে নি। আমায় বকুনি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে নিজে বাহাদুরী করতে গেছেন।

মণিমালা সরলাকে ভরসা দিয়ে বলে, না না, আপনি ভাববেন না। তেমন কিছু হলে খবর পাওয়া যেত। পাঁচ ছ'টা গুণ্ডার সঙ্গে একলা মারামারি করতে যাবে, প্রাণেশ অত বোকা ছেলে নয়।

প্রাণেশ্বর বাড়ি ফেরে বেলা পাঁচটায়। জামা কাপড়ে ধুলো কাদা ভরেছে। রক্তের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে ওখানে। কপালের বাঁ দিকের কালসিটেটা সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট।

বলে, সাবান দাও।

ঘরে গায়ে মাখা সবানের টুকরোও নেই। কাপড় কাচা সাবানের শেষাংশ দু'একটা আছে, কিন্তু সোডা মিশিয়ে ওই সাবানের টুকরোগুলি দিয়ে বাড়ির

কয়েকজনের জামাকাপড় পরদিন সেদ্ধ করে কেচে নিয়ে সাফ করে ধোপার খরচ কমাবার হিসাব নিকাশটা সরলা ইতিমধ্যে কষে রেখেছিল।

ধুলো কাদা রক্তের দাগ ধুয়ে ছেলের শরীরটা সাফসুফ করে নেবার দরকারের চেয়েও ওই হিসাবটাকে সে বড় করে দেয়। সত্যি সত্যি যেন কত জন্মের সৎ-মা!

উদাস ভাবে, সরলা বলে, সাবান নেই।

প্রাণেশ্বর হেসে বলে, আগেই রাগছ কেন? সব কথা শোন তারপর তো রাগ করবে! একটা কার্বলিক সাবান আনতে দাও, সাফ হয়ে নিয়ে সব বলছি।

ইন্দ্রাণী বলে, বলতে হবে না, কি হয়েছে আমরা টের পেয়েছি। মারামারি করতে এতক্ষণ লাগে? তেমন তো জখমও হও নি!

: থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল।

: ও!

রামনাথ বেঁচে থাকলে প্রাণেশ্বরের জীবনের গতি কোন দিকে যেত বলা কঠিন। বাপের সঙ্গে বিরামহীন সংঘাতই ছিল তার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষার মূল ভিত্তি। সে ছিল রামনাথের প্রাণের চেয়ে প্রিয়।

ডাক্তার হবার ঝোঁক চেপেছিল।

প্রায় মারামারি করে রামনাথ আর অন্য সকলকে রাজী করেছিল তাকে ডাক্তার করার জন্য দীর্ঘকাল ধরে বিরাট খরচের দায় মানতে।

যত বড় বড় উপাধি আর পাণ্ডিত্যই থাক, রামনাথ ছিল একটা হাই স্কুলের মাইনে করা পণ্ডিত। কিছু যজমানদের দান আর অনেক দিন ধরে অনেক খেটে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে লেখা বই-এর কপিরাইটের কিছু দাম, তিন পুরুষ আগে চালু করা বন্ধ্যাত্বের মাদুলি বিক্রীর কিছু আয়—এইসব খুচ্‌খাচ উপার্জন মিলিয়ে মিশিয়ে সংসার চলছিল।

কয়েক বিঘা দেবোত্তর জমি থেকে বিশ পঁচিশ মণ ধানও বছরে প্রাপ্য ছিল। পুরোটা পাওয়া যেত শুধু আদায় করতে পারলে।

রামনাথ কিছুতেই হার মানে নি। ছেলের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করেছিল শেষ পর্যন্ত। ত্যাগ ও সংযমের অনেকগুলি কঠিন সর্ত প্রাণেশ্বরকে মেনে নিতে হয়েছিল।

রামনাথ স্পষ্টই বলেছিল, তোমায় ডাক্তার করতে চাইলে বাড়ির সবাইকে আরও কম খেয়ে অনেক কষ্ট করে দিন কাটাতে হবে। তোমার ঝোঁকের খাতিরে সবাইকে এত কষ্ট আমি দিতে পারব না।

প্রাণেশ্বর বলেছিল, ডাক্তার হয়ে রোজগার করব না আমি? তোমাদের সকলের সুখের আরামের ব্যবস্থা করব না? তোমরা কি ভাবছ ডাক্তার হয়ে মোটা টাকা রোজগার করতে শুরু করেই আমি কেটে পড়ব? তোমার ছেলে অমন ছোটলোক নয় বাবা!

রামনাথ বলেছিল, বেশ তো, এ কথাটা ওদের গিয়ে বোঝাও। তোমায় ডাক্তার করার সাধ কি আমার নেই? এক ছেলে তুমি, পারলে আমি তোমায় লাটসায়েব করে দিয়ে চোখ বুজতে চাই না? কিন্তু অন্য সকলের কথাও তো বিবেচনা করতে হবে আমাকে। খবর নিয়েছি, হিসাবপত্র করেছি। তোমায় ডাক্তারি পড়াতে গেলে সকলকে সাত আট বছর খাওয়া পরার বিষম কষ্ট সইতে হবে।

একটু থেমে রামনাথ বলছিল, আমি সবার সঙ্গে কথা বলেছি। তোমার মা, সুনীতি আর প্রণতি এক পায়ে খাড়া, উপোস দিয়ে মরতেও রাজী। প্রণতির কথা বাদ দাও, ছেলেমানুষ ব্যাপারটা বুঝতেই পারছ না। একজন সত্যিকারের ডাক্তার দাদার বোন হবে ভাবতেই খুশীতে ওর নাড়ি ছেড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে। কিন্তু খাওয়া পরার কষ্ট সইতে হলে এ খুশীর ভাব কদিন টিকবে প্রাণেশ?

: সবাই মরুক বাঁচুক—আমি ডাক্তারি পড়বই।

: নিজের একটা ঝোঁকের জন্য অনায়াসে বলতে পারছ, সবাই মরুক বাঁচুক তুমি গ্রাহ্য কর না। তোমায় ডাক্তার করতে সবাই যারা কষ্ট করবে, ডাক্তার হয়ে তুমি যে তার দাম দেবে—আমার তো মনে হচ্ছে না প্রাণেশ! তখন

তোমার মগজে নতুন যুক্তি তর্ক গজাবে, তখন তুমি নতুন হিসেব কষবে, আজকের প্রতিজ্ঞা তখন তুচ্ছ হয়ে যাবে তোমার কাছে। তোমার ভাষাতেই বলি, সাত আট বছর পরে ওরকম যে হবে না তোমার চালচলন স্বভাব ব্যবহারে তার কোন গ্যারান্টি নেই। তবু উপায় নেই, সেকেলে বাপ, একমাত্র ছেলেকে মানুষ করাই তার সব চেয়ে বড় দায়! তুমি মানুষ হবে কিনা জানি না, তবে তুমি মানুষ হবার চেষ্টা করলে আমাকে তোমার পিছনে দাঁড়াতেই হবে।

: আমি কি অমানুষ হয়ে গেছি বাবা ?

: জানি না। সবাই বলছে ম্লেচ্ছ নাস্তিক বিপ্লবী হয়ে গেছ! তোমাদের ওসব হিসাব তো শিখিনি, জানিও না। আমার একটা নীতি আছে, আমি যা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি কাজেও তাই করি। তুমিও দেখছি এই নীতি নিয়েছ। এটা আমি খুব পছন্দ করি। এটাই মানুষের সেরা গুণ, সব ধর্মের মূল কথা। জানব, বুঝব, শিখব—যা কিছু মিথ্যা সংস্কার জানা মাত্র ত্যাগ করতে তৈরী থাকব। এই নীতি মেনেই দস্যু রত্নাকর ঋষি হতে পেরেছিলেন, মহাকবি হতে পেরেছিলেন। আমাকে যতই সেকেলে ভাবিস প্রাণেশ, আমি আসল কথাটা জানি। প্রাণ কি অনিয়মের দাসত্ব মানতে পারে রে বাবা ? বিশ্বজগৎ নিয়মে চলে, প্রাণও ওই নিয়মের ব্যাপার।

তারপর রামনাথ বলেছিল, বাড়ির সবাই যদি তোমায় ডাক্তার করার দায় নিতে রাজী হয়, আমি কেন আপত্তি করব ? ওদের বুঝিয়ে রাজী কর গিয়ে। কষ্ট করতে ওদের রাজী করালেই কিন্তু হবে না, কষ্ট তোমাকেও করতে হবে, কতগুলি অভ্যাস ছাড়তে হবে, কতগুলি বিষয়ে সংযত হতে হবে। নইলে আমি রাজী হব না।

প্রায় সকলকেই রাজী করেছিল প্রাণেশ্বর।

কত লোককে ধরাধরি করে, কত পয়সা খরচ করে ডাক্তার হওয়ার কলেজে ঢুকতেও পেরেছিল।

ডাক্তার হওয়ার প্রথম দু'বছরের শিক্ষাও পেয়েছিল।

সকলের কাছে যা তার পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল, সকলকে চমৎকৃত

করে তাও প্রাণেশ্বর সম্ভব করেছিল—নিজের কতগুলি স্বভাব বদলে দিয়েছিল। রামনাথও ভাবতে পারে নি প্রাণেশ্বর তাকে যে কথা দিয়েছিল, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সে তা পালন করে চলবে।

সংসারের হিসাবে বিগড়ে গিয়ে থাক, ছেলের একরোখা তেজের খবর রামনাথের জানা ছিল। সে চমৎকৃত হয় নি, গর্ব বোধ করেছিল।

: কিন্তু ডাক্তারি পড়ার লোভে নিজের নীতি বিসর্জন দিলি প্রাণেশ! তুই না আমার মত যা ঠিক বলে জানিস্, তাই করিস? বাড়ির লোকের যা সব কুসংস্কার বলে জানিস, সেসব মেনে নিলি?

: তা নয়, নীতি আমার ঠিক আছে। আমি তোমাকে মানছি। বাপের কথা শোনা উচিত, এটাও তো আমি মানি।

: সবাই বলবে, তোর মত অবাধ্য ছেলে হয় না। কোনদিন তুই আমার কথা শুনে চলিস নি। নিজের নীতিটা ছাঁটাই করার সাফাই দরকার, তাই বুঝি বাপের কথা শোনা উচিত—এই নীতিটা মানতে হল?

অন্য ছেলে কাবু হয়ে যেত, আবোল তাবোল কথা বলত। প্রাণেশ্বর কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি।

: কথাটা কি প্রাণ থেকে বললে বাবা, আমি চিরদিন তোমার অবাধ্য? আমি তো নীতি মানার যন্ত্র নই, অনেক দুষ্টামি করেছি, বাঁদরামি করেছি। ওকে অবাধ্য হওয়া বলেনা। সত্যি সত্যি সিরিয়াস্‌লি জোরের সঙ্গে কিছু বলেছ, আমি মানিনি—এরকম একটা উদাহরণ দাও তো? ছেলেবেলার কথা ধরবে না।

সুখী রামনাথ হেসে বলেচিল, সত্যি সত্যি সিরিয়াস্‌লি জোর দিয়ে বলা কথা না শুনলে অবাধ্যপণা হয়, এমনি কথা না শুনলে হয় দুষ্টামি। তোর কাছে নতুন কথা শিখলাম প্রাণেশ।

রামনাথ হঠাৎ মরে যাওয়ায় সব এলোমেলো হয়ে গেল।

ডাক্তার হয়ে রোগীকে আরোগ্যের ভরসা আর ওষুধ দিয়ে বড়লোক হবার কী জোরালো আগ্রহই জেগেছিল প্রাণেশ্বরের!

তোমার মগজে নতুন যুক্তি তর্ক গজাবে, তখন তুমি নতুন হিসেব কষবে, আজকের প্রতিজ্ঞা তখন তুচ্ছ হয়ে যাবে তোমার কাছে। তোমার ভাষাতেই বলি, সাত আট বছর পরে ওরকম যে হবে না তোমার চালচলন স্বভাব ব্যবহারে তার কোন গ্যারান্টি নেই। তবু উপায় নেই, সেকেলে বাপ, একমাত্র ছেলেকে মানুষ করাই তার সব চেয়ে বড় দায়! তুমি মানুষ হবে কিনা জানি না, তবে তুমি মানুষ হবার চেষ্টা করলে আমাকে তোমার পিছনে দাঁড়াতেই হবে।

: আমি কি অমানুষ হয়ে গেছি বাবা ?

: জানি না। সবাই বলছে ম্লেচ্ছ নাস্তিক বিপ্লবী হয়ে গেছ! তোমাদের ওসব হিসাব তো শিখিনি, জানিও না। আমার একটা নীতি আছে, আমি যা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি কাজেও তাই করি। তুমিও দেখছি এই নীতি নিয়েছ। এটা আমি খুব পছন্দ করি। এটাই মানুষের সেরা গুণ, সব ধর্মের মূল কথা। জানব, বুঝব, শিখব—যা কিছু মিথ্যা সংস্কার জানা মাত্র ত্যাগ করতে তৈরী থাকব। এই নীতি মেনেই দস্যু রত্নাকর ঋষি হতে পেরেছিলেন, মহাকবি হতে পেরেছিলেন। আমাকে যতই সেকেলে ভাবিস প্রাণেশ, আমি আসল কথাটা জানি। প্রাণ কি অনিয়মের দাসত্ব মানতে পারে রে বাবা ? বিশ্বজগৎ নিয়মে চলে, প্রাণও ওই নিয়মের ব্যাপার।

তারপর রামনাথ বলেছিল, বাড়ির সবাই যদি তোমায় ডাক্তার করার দায় নিতে রাজী হয়, আমি কেন আপত্তি করব ? ওদের বুঝিয়ে রাজী কর গিয়ে। কষ্ট করতে ওদের রাজী করালেই কিন্তু হবে না, কষ্ট তোমাকেও করতে হবে, কতগুলি অভ্যাস ছাড়তে হবে, কতগুলি বিষয়ে সংযত হতে হবে। নইলে আমি রাজী হব না।

প্রায় সকলকেই রাজী করেছিল প্রাণেশ্বর।

কত লোককে ধরাধরি করে, কত পয়সা খরচ করে ডাক্তার হওয়ার কলেজে ঢুকতেও পেরেছিল।

ডাক্তার হওয়ার প্রথম দু'বছরের শিক্ষাও পেয়েছিল।

সকলের কাছে যা তার পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল, সকলকে চমৎকৃত

করে তাও প্রাণেশ্বর সম্ভব করেছিল—নিজের কতগুলি স্বভাব বদলে দিয়েছিল। রামনাথও ভাবতে পারে নি প্রাণেশ্বর তাকে যে কথা দিয়েছিল, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সে তা পালন করে চলবে।

সংসারের হিসাবে বিগড়ে গিয়ে থাক, ছেলের একরোখা তেজের খবর রামনাথের জানা ছিল। সে চমৎকৃত হয় নি, গর্ব বোধ করেছিল।

: কিন্তু ডাক্তারি পড়ার লোভে নিজের নীতি বিসর্জন দিলি প্রাণেশ! তুই না আমার মত যা ঠিক বলে জানিস্, তাই করিস? বাড়ির লোকের যা সব কুসংস্কার বলে জানিস, সেসব মেনে নিলি?

: তা নয়, নীতি আমার ঠিক আছে। আমি তোমাকে মানছি। বাপের কথা শোনা উচিত, এটাও তো আমি মানি।

: সবাই বলবে, তোর মত অবাধ্য ছেলে হয় না। কোনদিন তুই আমার কথা শুনে চলিস নি। নিজের নীতিটা ছাঁটাই করার সাফাই দরকার, তাই বুঝি বাপের কথা শোনা উচিত—এই নীতিটা মানতে হল?

অন্য ছেলে কাবু হয়ে যেত, আবোল তাবোল কথা বলত। প্রাণেশ্বর কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি।

: কথাটা কি প্রাণ থেকে বললে বাবা, আমি চিরদিন তোমার অবাধ্য? আমি তো নীতি মানার যন্ত্র নই, অনেক দুষ্টামি করেছি, বাঁদরামি করেছি। ওকে অবাধ্য হওয়া বলেনা। সত্যি সত্যি সিরিয়াস্‌লি জোরের সঙ্গে কিছু বলেছ, আমি মানিনি—এরকম একটা উদাহরণ দাও তো? ছেলেবেলার কথা ধরবে না।

সুখী রামনাথ হেসে বলেছিল, সত্যি সত্যি সিরিয়াস্‌লি জোর দিয়ে বলা কথা না শুনলে অবাধ্যপণা হয়, এমনি কথা না শুনলে হয় দুষ্টামি। তোর কাছে নতুন কথা শিখলাম প্রাণেশ।

রামনাথ হঠাৎ মরে যাওয়ায় সব এলোমেলো হয়ে গেল।

ডাক্তার হয়ে রোগীকে আরোগ্যের ভরসা আর ওষুধ দিয়ে বড়লোক হবার কী জোরালো আগ্রহই জেগেছিল প্রাণেশ্বরের!

তোমার মগজে নতুন যুক্তি তর্ক গজাবে, তখন তুমি নতুন হিসেব কষবে, আজকের প্রতিজ্ঞা তখন তুচ্ছ হয়ে যাবে তোমার কাছে। তোমার ভাষাতেই বলি, সাত আট বছর পরে ওরকম যে হবে না তোমার চালচলন স্বভাব ব্যবহারে তার কোন গ্যারান্টি নেই। তবু উপায় নেই, সেকেলে বাপ, একমাত্র ছেলেকে মানুষ করাই তার সব চেয়ে বড় দায়! তুমি মানুষ হবে কিনা জানি না, তবে তুমি মানুষ হবার চেষ্টা করলে আমাকে তোমার পিছনে দাঁড়াতেই হবে।

: আমি কি অমানুষ হয়ে গেছি বাবা?

: জানি না। সবাই বলছে ম্লেচ্ছ নাস্তিক বিপ্লবী হয়ে গেছ! তোমাদের ওসব হিসাব তো শিখিনি, জানিও না। আমার একটা নীতি আছে, আমি যা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি কাজেও তাই করি। তুমিও দেখছি এই নীতি নিয়েছ। এটা আমি খুব পছন্দ করি। এটাই মানুষের সেরা গুণ, সব ধর্মের মূল কথা। জানব, বুঝব, শিখব—যা কিছু মিথ্যা সংস্কার জানা মাত্র ত্যাগ করতে তৈরী থাকব। এই নীতি মেনেই দস্যু রত্নাকর ঋষি হতে পেরেছিলেন, মহাকবি হতে পেরেছিলেন। আমাকে যতই সেকেলে ভাবিস প্রাণেশ, আমি আসল কথাটা জানি। প্রাণ কি অনিয়মের দাসত্ব মানতে পারে রে বাবা? বিশ্বজগৎ নিয়মে চলে, প্রাণও ওই নিয়মের ব্যাপার।

তারপর রামনাথ বলেছিল, বাড়ির সবাই যদি তোমায় ডাক্তার করার দায় নিতে রাজী হয়, আমি কেন আপত্তি করব? ওদের বুঝিয়ে রাজী কর গিয়ে। কষ্ট করতে ওদের রাজী করালেই কিন্তু হবে না, কষ্ট তোমাকেও করতে হবে, কতগুলি অভ্যাস ছাড়তে হবে, কতগুলি বিষয়ে সংযত হতে হবে। নইলে আমি রাজী হব না।

প্রায় সকলকেই রাজী করেছিল প্রাণেশ্বর।

কত লোককে ধরাধরি করে, কত পয়সা খরচ করে ডাক্তার হওয়ার কলেজে ঢুকতেও পেরেছিল।

ডাক্তার হওয়ার প্রথম দু'বছরের শিক্ষাও পেয়েছিল।

সকলের কাছে যা তার পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল, সকলকে চমৎকৃত

করে তাও প্রাণেশ্বর সম্ভব করেছিল—নিজের কতগুলি স্বভাব বদলে দিয়েছিল। রামনাথও ভাবতে পারে নি প্রাণেশ্বর তাকে যে কথা দিয়েছিল, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সে তা পালন করে চলবে।

সংসারের হিসাবে বিগড়ে গিয়ে থাক, ছেলের একরোখা তেজের খবর রামনাথের জানা ছিল। সে চমৎকৃত হয় নি, গর্ব বোধ করেছিল।

: কিন্তু ডাক্তারি পড়ার লোভে নিজের নীতি বিসর্জন দিলি প্রাণেশ! তুই না আমার মত যা ঠিক বলে জানিস্, তাই করিস? বাড়ির লোকের যা সব কুসংস্কার বলে জানিস, সেসব মেনে নিলি?

: তা নয়, নীতি আমার ঠিক আছে। আমি তোমাকে মানছি। বাপের কথা শোনা উচিত, এটাও তো আমি মানি।

: সবাই বলবে, তোর মত অবাধ্য ছেলে হয় না। কোনদিন তুই আমার কথা শুনে চলিস নি। নিজের নীতিটা ছাঁটাই করার সাফাই দরকার, তাই বুঝি বাপের কথা শোনা উচিত—এই নীতিটা মানতে হল?

অন্য ছেলে কাবু হয়ে যেত, আবোল তাবোল কথা বলত। প্রাণেশ্বর কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি।

: কথাটা কি প্রাণ থেকে বললে বাবা, আমি চিরদিন তোমার অবাধ্য? আমি তো নীতি মানার যন্ত্র নই, অনেক দুষ্টামি করেছি, বাঁদরামি করেছি। ওকে অবাধ্য হওয়া বলেনা। সত্যি সত্যি সিরিয়াস্‌লি জোরের সঙ্গে কিছু বলেছ, আমি মানিনি—এরকম একটা উদাহরণ দাও তো? ছেলেবেলার কথা ধরবে না।

সুখী রামনাথ হেসে বলেচিল, সত্যি সত্যি সিরিয়াস্‌লি জোর দিয়ে বলা কথা না শুনলে অবাধ্যপণা হয়, এমনি কথা না শুনলে হয় দুষ্টামি। তোর কাছে নতুন কথা শিখলাম প্রাণেশ।

রামনাথ হঠাৎ মরে যাওয়ায় সব এলোমেলো হয়ে গেল।

ডাক্তার হয়ে রোগীকে আরোগ্যের ভরসা আর ওষুধ দিয়ে বড়লোক হবার কী জোরালো আগ্রহই জেগেছিল প্রাণেশ্বরের!

নিজেই সে বন্ধ করে দেয় ডাক্তারি শেখা। খেয়ালের বশে নয়। আরও চার বছর কেন, ছ'মাস পড়া চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে গেছে। কি করে এবার সংসার চলবে ভেবে বিবর্ণ হয়ে গেছে বাড়ির সকলের মুখ।

বাড়ির সকলকে সে বলে, ভয় নেই, তোমরা ভড়কে যেওনা।

বলে, কেন ভাবছ মা? ডাক্তার না হতে পারি, একটা চাকিরও না জোটাতে পারি, ডাক্তার কাকার মত রোগী দেখে কিছু তো রোজগার করতে পারব? ডাক্তার কাকা ডাক্তারি কলেজের ধারও ঘেঁষে নি, আমি তবু বড় কলেজে দু'বছর শিখলাম।

রক্ত পচে গিয়ে কী শোচনীয় মৃত্যুই যে ঘটল রামনাথের। সামান্য একটা ঘা থেকে রক্ত বিষাক্ত হয়ে পচে গিয়ে কী যন্ত্রণা পেয়েই মরল।

সিদুঁর গাঁয়ের এক যজমানের বাড়িতে বাৎসরিক পূজা সারতে গিয়ে খালের একটা বাঁশের সাঁকো পার হবার সময় পা পিছলে পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছিল। অন্য আঘাত তেমন গুরুতর হয় নি, বাঁ উরুতে সরু একটা কঞ্চি ঢুকে গিয়েছিল।

সেটা টেনে বার করার পরেই শুরু হয়েছিল সেকি রক্তপাত! তাজা লাল রক্ত যেন পিচকারির গোলা রঙের মত ফিনকি দিয়ে ছিটকে বেরিয়েছিল।

হাত দিয়ে ক্ষত মুখ চেপে রেখে দেড় মাইল দূর থেকে ডাক্তার আনিয়ে সেলাই আর ব্যাণ্ডেজ করিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল রক্তপাত।

যজমানের বাৎসরিক কাজ সেরে বাড়িও ফিরেছিল রামনাথ।

রক্তপাত ঠেকানো ওই ঘা-টাই বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। রক্ত পচিয়ে দিয়েছিল।

পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছিল যথেষ্ট মাত্রায়।

কোন ফল হয় নি।

কারণ, ব্যাকুল প্রাণেশ্বর কিনে এনেছিল পেনিসিলিন। এবং সেগুলো ছিল ভেজাল।

একটা ফাইল বাড়তি হয়েছিল পেনিসিলিনের। শ্যামাদাস সেটা নিয়ে গিয়েছিল।

রামনাথের শ্রাদ্ধের দিন নিমন্ত্রণ রাখতে এসে খেদের সঙ্গে সে প্রাণেশ্বরকে বলে, ডাক্তারি ছেড়ে দেব ভাবছি প্রাণেশ।

: কেন ডাক্তার কাকা ?

: ওষুধে এত ভেজাল হলে কি ডাক্তারি করা পোষায় ? তাও আবার পাশকরা ডাক্তার নই ! মনে হয় কি জানিস ? ডাক্তার সেজে ভেজাল ওষুধ দিয়ে মানুষ খুন করার ব্যবসা নিয়েছি।

প্রাণেশ্বর বলে, ছোটখাট একটা ডিসপেন্সারী দিন না ? নিজে খাঁটি ওষুধ আনবেন, রোগীদের খাঁটি ওষুধ দেবেন।

: ওষুধের দোকান দেবার টাকা থাকলে কি আর দিতাম না রে !

কথাটা তখন প্রাণেশ্বর নেহাত ঝোঁকের মাথাতেই বলেছিল। নাম করা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাপ যে মরে গিয়ে ছেলেকে এমন হাঙ্গামায় ফেলতে পারে, সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি।

শ্রাদ্ধ শান্তির ঝনঝাটে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

ওসব ব্যাপার চুকে যাবার পর, এবার কি করবে না করবে ভাবতে শুরু করার পর, ওষুধের দোকানের কথাটা আবার তার মাথায় আসে।

শ্যামাদাস সেল্‌ফ-মেড ডাক্তার। নিজেকে নিজে শিখিয়ে ডাক্তার হয়েছে। দু'বছর মেডিকেল কলেজে পড়ার বড়াই করে সরলাকে সে ভরসা দিয়েছে যে ডাক্তারি স্কুল বা কলেজে নাম না লিখিয়েও শ্যামাদাস যদি ডাক্তারি করে পয়সা কামাতে পারে, সেও নিশ্চয় পারবে।

কিন্তু মনে মনে প্রাণেশ্বর জানে, শ্যামাদাসের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাত।

শ্যামাদাসের চিকিৎসায় যারা নির্ভর করে, তাকে দক্ষিণা দিয়ে পরম বিশ্বাসের সঙ্গে তার ওষুধ ও ব্যবস্থা মেনে নেয়, তাদের কাছে শ্যামাদাস শুধু দেহের রোগের চিকিৎসক নয়, সে গায়ক সাধক, গুণী মানুষ।

কম পয়সায় তবু তো একটা চিকিৎসা করানো হবে মনে করে গরিব নিরুপায় মানুষেরাই শুধু তার শরণ নেয় না, মোটা ফি-এর পাশ-করা নাম-করা আসল ডাক্তার ডাকবার ক্ষমতা আছে এরকম কয়েকজনও আগে শ্যামাদাসকে কল দেয়।

শ্যামাদাস বললে তবে আসল ডাক্তার আসে।

এভাবে জমিয়ে বসে চিকিৎসাকে পেশা করা তার ধাতে নেই, সাধ্যেও কুলোবে না।

শ্যামাদাসের মতই না হয় নীতি গ্রহণ করবে যে সাধারণ জ্বর কাসি পেটের ব্যারাম বাতের ব্যথা ইত্যাদি সাধারণ রোগ ছাড়া সে কঠিন রোগের চিকিৎসার দায় নেবে না, শ্যামাদাসের চেয়ে এসব রোগের চিকিৎসা সে অনেক ভাল ভাবেই করতে পারবে—সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরে শ্যামাদাস আজও শুধু কুইনিন চালায়, ম্যালেরিয়ার আরেকটা যে ভাল প্রতিষেধক বেরিয়েছে সে খবর জেনেও গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু বিশ্বাস করে তাকে কে ডাকবে? তার চিকিৎসার আরাম হবার আশায় কে তার গুণপণা মানবে?

ধার্মিক পণ্ডিত সদ্ ব্রাহ্মণের ঘরে দুরন্ত একগুঁয়ে চ্যাংড়া ছেলে হয়ে জন্মেছে—সকলের কাছে এই তো তার পরিচয়!

প্রাণেশ্বর কয়েকদিন ভাবে।

কোন গুরুতর বিষয়ে তার চিন্তা করার কায়দাও থাপছাড়া উদ্ভট—বাড়ির মানুষ হকচকিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়।

খুব ভোরে উঠেছে। ব্রাহ্ম মুহূর্তে।

আগে থেকে জেগে ছিল কিনা তাই বা কে জানে!

বিড়ি টানতে টানতে কয়লা-ফেলা উনানে পাটখড়ি জ্বালিয়ে জল ফুটিয়ে নিজের জন্য এক কাপ পানীয় তৈরির কাজটা প্রাণেশ্বর প্রায় নিঃশব্দেই করে—তবু সরলার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

: আমায় ডেকে বললেই তো করে দিতাম?

: সারাদিন খেটে খেটে হাড়মাস ক্ষয় করেছ, ঘুমোও না? আমার কাজ, আমার হিসেব আমি ঠিক করে যাচ্ছি।

সরলা উঠে বসে বলে, আমায় দগ্ধে মারছিস। প্রাণেশ্বর কাপে চুমুক দিয়ে বলে, ওটা তোমার নিজের প্রাণের জ্বালা মা। ওটা সামলাও। ভাল চেয়ে আমার তুমি মন্দ কোরো না।

সূর্যোদয় হয়েছে কি না হয়েছে, প্রাণেশ্বর অদ্ভুত অজানা এক অসুখে কাতর হয়ে ছটফট করতে থাকে।

বলে, ডাক্তার কাকুকে ডাকাও।

বেলা নটার পর শ্যামাদাস এলে চাঙ্গা হয়ে বিছানায় উঠে বসে বলে, ডাক্তার কাকু রাগবেন না, আমি ইচ্ছে করে আপনাকে এভাবে ডাকিয়ে এনেছি। কতবার যাব, পাত্তা পাব কি পাব না, কে জানে! পেট ছাড়লেই বাবা কতবার ডেকে পাঠিয়েছেন, এসে শুধু সোডি-বাই-কার্ব আর সিরাপ মেশানো মিকশ্চার দিয়ে বাবার মন ভুলিয়েছেন।

শ্যামাদাস খাটে বসে দাড়ি চুলকায়। সরলা ঘরে তৈরী চা আর দোকানে তৈরী সিঙ্গারা এনে দিলে চা-সিঙ্গাড়া খেতে খেতেই সরলাকে জিজ্ঞাসা করে, ছেলের আজকাল মতিগতি কি রকম?

সরলা বলে, উনি গত হবার পর ছেলেই তো সামলাচ্ছে। মতিগতি বুঝিনে ওর আমি। কি ভাবে কি করে, ও-ই জানে, আমি মোটে বুঝিনে কিছু। তবে কিনা চালিয়ে নিয়ে চলেছে। বলছে যে চালিয়ে নিয়ে যাবে।

সরলা চলে যাবার পর শ্যামাদাস জিজ্ঞাসা করে, মতলবটা কি?

প্রাণেশ্বর বলে, মতলব ভাল। দুজনে মিশে মিলে একটা ওষুধের দোকান দিই আসুন।

তার কথা যেন শুনতেই পায় নি এমনিভাবে শ্যামাদাস খুঁটে খুঁটে সিঙ্গারা খায়, চায়ের কাপে একবার দুবার চুমুক দেয়।

প্রাণেশ্বর শান্ত কণ্ঠে বলে, বয়স কম, খেলাধুলোয় মন ছিল, সবাই তাই

আমায় চ্যাংড়া বলে। এটা চ্যাংড়ামি নয় ডাক্তার কাকু! আমায় কিছু করতে হবে তো? ভেবে দেখলাম, দুজনে মিলে যদি ওষুধের দোকান দিই, তোমারও লাভ, আমারও লাভ।

: দুজনে মিলে?

: হ্যাঁ, দুজনে মিলে। বাবা হাজার দেড়েক নগদ রেখে গিয়েছিলেন। শ্রাদ্ধ শান্তিতে দুশোর মত বেরিয়ে গেছে। আমি হাজার দেব, তুমি হাজার দেবে—দুজনে মিলে এসো না একটা ওষুধের দোকান খুলি?

শ্যামদাস চুপ করে থাকে।

প্রাণেশ্বর বলে, কম্পাউণ্ডার রাখতে হবে না, ও কাজটা আমিই করব। তুমি হবে ডাক্তার, আমি হব কম্পাউণ্ডার।

: দাঁড়া, ভেবে দেখি।

শ্যামাদাস একটা রাত ভাবে।

কখন যে ভাবে কে জানে।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈদ্যবাজারে আসর জমিয়ে গান শুনিয়ে সন্ধ্যার পর থেকে শ্যামনগরের আসরে জমে গিয়ে রাত এগারোটা বাজিয়ে দেয়।

তারপর কখন ঘরে ফেরে, কখন কি খেয়ে কখন ঘুমায়, কে তার হিসাব রাখে।

রোদ-ওঠা ভোরে এসে প্রাণেশ্বরের ঘুম ভাঙিয়ে বলে, এমন তুই ঘুম-কাতুরে? কিছু কি তুই করতে পারবি? আমার তো ভরসা হচ্ছে না প্রাণেশ।

: ছোট পিসীর কাল কলেরা হয়েছিল। দিনরাত ছুটোছুটি করেছি। ছুটো আড়াইটের সময় শুয়েছি।

: আমার তুই লজ্জা দিলি প্রাণেশ।

: লজ্জা কিসের? তুমি কি জানতে? ছোটপিসীকে হাসপাতালে দিতে এত ঝন্‌ঝাট পোয়াতে হল কেন ডাক্তারকাকু? হাসপাতাল তবে কিসের জন্য?

সবে সূর্যোদয় ঘটেছিল। এ ঘরে রোদ উঁকি দেয় না। এ ঘরের সামনে

ঘরে পরিষ্কার করা বারান্দায় রঙ করা কাঠের দেয়াল জানলায় বেলা তিনটে নাগাদ এক ফালি রোদ এসে পরে।

তিনতলা বাড়িটার পাস কাটিয়ে রোদের ফালিটা আসে—কিছুক্ষণের জন্য।

শ্যামাদাস গুম খেয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। সরলা তাদের চালগুড়োর পাটি নামক রুটি আর নারকেলের সন্দেশ দিয়ে যায়।

প্রণতি এনে দেয় গরম কাপের পানীয়।

কাপে শেষ চুমুক দিয়ে শ্যামাদাস বলে, তাই হোক, ছ্যাচড়া বুড়ো আমি আর চ্যাংড়া যোয়ান তুই—দুজনে মিলে দোকান খুলি আয়। হাজার টাকা দিবি বলেছিলি, দে।

প্রাণেশ্বর বলে, টাকাটা কি ক্যাস বাক্সে রেডি করে রেখেছি ?

দু পাঁচ টাকা করে পোস্টাপিসে রামনাথ কিছু টাকা জমিয়েছিল—সারা জীবনের সঞ্চয়। শ তিনেক টাকা হাতে রেখে থোক হাজার টাকা প্রাণেশ্বর শ্যামাদাসের হাতে তুলে দেয়।

শ্যামাদাসও হাজারখানেক সংগ্রহ করে—গুণমুগ্ধ অনেকের কাছে ধার নিয়ে—অনির্দিষ্ট কালের মেয়াদে। আরও টাকা সে যোগাড় করতে পারত, কিন্তু পাওয়া যাবে জেনেও কোন একজনের কাছ থেকে সে বেশী টাকা নেয় নি।

: কেন জানিস ? বেশী টাকার খাতক হলে আর খাতির থাকে না। পঞ্চাশ যাটটা টাকা—দয়া করে চেয়ে নিয়ে আমিই যেন অনুগ্রহ করেছি। বেশী নিলেই অন্যরকম দাঁড়াত।

একজন ভক্ত জোর করে পাঁচশো টাকা জমা দেয়। তার নাম দুর্গাপদ, এককালে অবস্থা ভাল ছিল, মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছে। তার আগে মদ ধরেছিল তার যোয়ান ছেলে, নেশা বেশী চড়াবার সুযোগ পায় নি, নিমুনিয়া হয়ে মারা গিয়েছিল। ছেলের শোকে নয়, বছরখানেক পরে বৌ মারা গেলে হঠাৎ সে নেশাটা ধরেছিল। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছে, প্রাণেশ্বরের বয়সী ছোট ছেলেটারও বিয়ে দিয়েছে। কোন দায় নেই।

দুর্গাপদ তাই বলে, না রে দাদা, সব উড়িয়ে দিয়েছি বলে আত্মার এতটুকু আপসোস নেই। কি হত ওসব রেখে? নিজেই ভোগ করে গেলাম।

শ্যামাদাসের ওষুধের দোকানের জন্য টাকা দেবার আগ্রহের কারণটা নিজেই সে ব্যাখ্যা করে। বলে, নেশার মজা টের পেতে শুরু করেছি—লিভারে। বেশীদিন নয়—ওষুধপত্র খেতে হবে। টাকাটা জমা রইল, দোকান চালু করতে গোড়ায় আপনার কাজে লাগবে, পরে দরকারের সময় ওষুধপত্র খেয়ে পুষিয়ে নেব।

শ্যামাদাস বলে, পাঁচশো টাকার ওষুধ খেতে যে অনেকদিন লাগবে দুর্গাবাবু!

: সহজে কি মরব, না সহজে রোগ সারবে? সে হিসাব করেই রেখেছি।

প্রাণেশ্বর বলে, ছেড়ে দিন না?

দুর্গাপদ হেসে বলে, আর কি ছাড়া যায় রে ভাই?

শিষ্য নয় কিন্তু শ্যামাদাসকে দুর্গাপদ সত্যই ভক্তি করে। প্রাণেশ্বর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে যে দুর্গাপদর মদ ছেড়ে দিয়ে লিভারটা বাঁচানোর প্রসঙ্গে শ্যামাদাস একটি কথা বলে না।

ইন্দ্রাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, বেশ বুদ্ধি করেছ—ডিসপেনসারী দিচ্ছ। বাবার ওষুধগুলো তো খাঁটি পাওয়া যাবে তোমার দোকান থেকে।

মৃদুলা বলে, ওষুধের দোকান দেবে? চালাতে পারবে? ভেজাল ওষুধ না দিয়ে নাকি চালানো যায় না ওষুধের দোকান। তোমরা পারবে তো?

প্রাণেশ্বর বলে, তোমার কথা সত্যি হলে পারব না। ভেজাল ছাড়া দোকান যদি না চলে, দোকান ডুবে যাবে, আমিও ডুবে যাব। তবু একবার চেষ্টা করে দেখি। একটা কিছু তো করতে হবে।

মৃদুলা বলে, আমি অবশ্য শোনা কথা বলছি। আমি কি জানি ভেতরের খবর?

প্রাণেশ্বর জোর দিয়ে বলে, ভেজালের ব্যাপার আমিও শুনেছি, খানিক

খানিক জানি। ভেজালের মরসুম চলেছে, সেটা সত্যি কথা। কিন্তু সবাই কি আর ভেজাল চালাচ্ছে। ফাঁকি দিয়ে জগৎ চলে আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি ভেজাল নই, তুমি ভেজাল নও, জগৎটা ভেজালে চলবে কি করে?

: তোমায় আমায় নিয়েই তো জগৎ নয়!

: তবে কাকে নিয়ে জগৎ? তোমায় আমায় বাদ দিয়ে যে জগৎ, সে জগৎ নিয়ে তোমার আমার মাথাব্যথা কিসের? থাকলে থাক, চুলোয় যাক—আমাদের বয়ে গেল!

সারাদিন প্রায় ডিসপেন্সারীতেই কাটে।

সকাল আটটায় গিয়ে ডিসপেন্সারী খোলে, দেড়টা দুটোয় বাড়ি ফিরে স্নানাহার সেরে আবার চারটে নাগাদ যায়। বাড়ি ফিরতে হয় রাত সাড়ে দশটা এগারটা।

বাড়ি থেকে ডিসপেন্সারীটা বেশী দূরে নয়, এই একটা মস্ত সুবিধা।

শ্যামাদাস এতদিন যে দোকানে বসত সেখানে তার প্রেসক্রুপশনের ওষুধ বিক্রির হিসাবে একটা কমিশনের ব্যবস্থা ছিল। কমিশনের আয়টা বাড়াতে শ্যামাদাস যে কত অনাবশ্যক আর দামী ওষুধ তার রোগীদের খাওয়াত, তার নিজের ডিসপেন্সারীতে কিছুদিন কম্পাউণ্ডারী করেই প্রাণেশ্বর সেটা ভালভাবে টের পেয়েছে।

ওষুধের বিক্রি বাড়াতে এখানেও শ্যামাদাস সেই কায়দা খাটাচ্ছে।

স্পষ্টই যার ম্যালেরিয়া, যার শুধু কুইনিন বা পেলুড্রিন দেওয়াই যথেষ্ট, তাকে শ্যামাদাস দেয় কুইনিন মিকশ্চার—কুইনিনের সঙ্গে আরও কয়েকরকম ওষুধ মিশিয়ে। কাজ হয় কুইনিনেই এবং আট দশগুণ দাম দিলেও রোগী বা রোগীর আত্মীয় সন্তুষ্ট হয়।

তবে রোগীরাও তাকে বাড়িতে ডেকে ফি গোনা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে দোকানে এসে লক্ষণাদি বলে ওষুধ নিয়ে যায়।

কতরকমের এবং কত দামী অনাবশ্যক ওষুধ কোন রোগীকে কতকটা দেবে তারও ফরমূলা বাঁধা আছে শ্যামাদাসের। রোগীর পয়সা দেবার ক্ষমতা অনুসারে ওষুধের দামটা সে বেশী বা কম করে!

তবে এক হিসেবে সে চূড়ান্ত রকম অনেস্ট।

মিকশ্চারে বা অন্তভাবে রোগীকে অনাবশ্যক ওষুধ গছিয়ে দিলেও দাম সে নেয় ওষুধের হিসাবেই।

ব্যাপারটা ধরতে পাবার পর প্রথমে একটা কথা ভেবে প্রাণেশ্বর সত্যই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল! ম্যালেরিয়ার রোগীকে কুইনিন এবং আরও দু একটা দরকারী ওষুধের সঙ্গে নির্দোষ কিন্তু একেবারে অনাবশ্যক ওষুধ মিশিয়ে দাম বাড়াবার দরকার কি?

দরকারী ওষুধের সঙ্গে খানিকটা বেশী সিরাপ ও জল মিশিয়ে সোজাসুজি বেশী দাম ধরলেই হয়? অনেক বেশী লাভ থাকে!

অল্প দিনেই সে বুঝতে পারে শ্যামাদাসের নীতিটা। তার হল, অনেস্টি ইজ দি বেষ্ট পলিশি—সততাই সেরা নীতি।

রোগী বা রোগীর প্রতিনিধি এবং আরও পাঁচ সাত জনের সামনে সে প্রেসক্রপশন লেখে, মাঝে মাঝে আপসোস করে বলে, আমার ওষুধের দাম নাকি বেশী! প্রেসক্রপশন নিয়ে গিয়ে অন্য দোকানে যাচাই করলেই হয়! কোন রিলায়েবল ডিসপেন্সারী যদি আমার চেয়ে কম পয়সায় এ প্রেসক্রপশন সার্ভ করতে পারে—

শ্যামাদাস একটু হাসে।—প্রাণেশকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। ওকে বলাই আছে ওষুধের নীট্ দাম কষবে।

দু চার জন কি আর প্রেস্ক্রপশন অন্য ডিসপেন্সারীতে যাচাই না করে ছেড়েছে! কিন্তু এতগুলি দামী ওষুধ মেশানো মিক্শ্চার কোন্ অ-চোরাবাজারী ডিসপেন্সারী কম দামে দিতে পারবে!

পুরানো রোগী ব্যোমকেশ তাই বলে, না, না, তাই কি হয়। খাঁটি ওষুধ খান বলেই তো ফল পাই।

শ্যামাদাস একদিন নিজে থেকেই প্রাণেশ্বরকে বলে, তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয় প্রাণেশ। বেশী ওষুধ বেচাটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্যে নয়। বুঝতে পার না, বাড়তি ওষুধগুলি অন্য সিমটম ঠেকাবার জন্য দিই? ওসব লক্ষণ

তখন নেই কিন্তু পরে দেখা দিতে তো পারে? আমি আগে থেকেই ঠেকাবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

প্রাণেশ্বর হেসে বলে, কে জানে, হিসাবটা ঠিক বুঝি না।

শ্যামাদাস বলে, তাছাড়া, সবাইকে তো দিই না। পয়সা আছে, অনায়াসে দুটো বাড়তি ওষুধ খেয়ে হজম করতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে ঠিক, শুধু ট্যাবলেট দিলেই কাজ হয়, কিন্তু অনায়াসে পারে তবু ব্রঙ্কাইটিস ঠেকাবার ওষুধ খাবে না কেন?

প্রাণেশ্বর ওষুধ তৈরি করতে করতে মুখ না তুলেই বলে, এ হিসাবটা করেন বলেই চুপচাপ মেনে নিয়েছি—নইলে আমাদের ঝগড়া হয়ে যেত।

রং আরেকটু ফর্সা হলে প্রাণেশ্বরকে রীতিমত সুপুরুষ বলা যেত। সকলে খেয়াল করে না, করলে আত্মীয় বন্ধু অনেকের কাছে, প্রায়ই যাদের তাকে চোখে দেখতে হয়, তার চেহারার একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ত।

প্রাণেশ্বরের চেহারার একটা আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে থাকে।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গা প্রাণেশকে দেখে আজ হয় তো মনে হয় যে কী রুক্ষ কঠিন চেহারাই না তার হয়েছে। সারাদিন রোদ তাপ আর খাটুনির পর সেইদিনই বিকালের দিকে তাকে আবার দেখে হয় তো মনে হয়, না, মুখখানা বেশ কমনীয়ই তো প্রাণেশের!

কয়েকদিন একটানাও চলে সুস্পষ্ট রুক্ষতা বা কমনীয়তার ভাব—হয় তো রাতারাতি আবার একটা বদল হয়ে যায় অন্যটায়।

মন মেজাজেরও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু যতটা ঘটে তার খুব সামান্যই ধরা পড়ে মানুষের কাছে। কারণ মোটেই একাচোরা মানুষ না হলেও প্রাণেশ্বর বড়ই চাপা মানুষ। ঘনিষ্ঠ লোকের পক্ষেও তার প্রাণের গভীরতার হদিস পাওয়া শক্ত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে, আজকাল নিজের চেতনার রূপান্তর প্রাণেশ নিজেই অনুভব করে। সে টের পায়, এ অতি গুরুতর ব্যাপার। সাধারণ জীবন যাত্রায় এর প্রতিফলন ঘটতে দিলে তার মুশকিলের সীমা থাকবে না।

লোকে তাকে পাগল ভাববে।

চালচলনে যেটুকু খাপছাড়া ভাব প্রকাশ পায় তাতেই লোকের ধারণা জন্মে গেছে যে সে পাগলাটে খামখেয়ালী মানুষ।

শুধু কথায় নয়, কাজেও সে দায়িত্বশীল, দায় আর কর্তব্যপালনে নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়েই এই বয়সে সকলের বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হতে পেরেছে—তবু তার চেহারা আর মুখের অদ্ভুত রকম ওলটপালট ঘটার ছাড়া ছাড়া উপর উপর নমুনা মানুষের কাছে তাকে করে দিয়েছে পাগলাটে।

সমর বলে, সময় আর সুযোগ থাকলে আমি তোকে বছর দুই আণ্ডার অবজারভেসন রেখে দেখতাম ব্যাপারটা কি। তোর কাছ থেকে সূত্র পেয়ে বড় কিছু আবিষ্কার করে হয়তো বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে যেতাম।

: সাইকোলজিতে?

: না, বায়োলজি বা ফিজিওলজিতে। তোর দেহে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে, বিজ্ঞান আজও যার মানে বোঝে না। এরকম ব্যাপার নানাভাবে ঘটতে পারে—শুধু এইটুকু জানে। কেন ঘটে, কি ভাবে ঘটে—একদম জানে না, বোঝে না।

: দেহ ঠিক আছে। দেহে কোন অঘটন ঘটে না। মনটা খারাপ হয়ে গেলে দেহটা কেমন বিগড়ে যায়।

: মনটা বুঝি তোর দেহে থাকে না? তোর দেহ আর মন বুঝি ভিন্ন?

: সে তোমরা জানো!

আকাশে মেঘ ঘনালেই প্রাণেশের মুখ তাজা হয়ে ওঠে—শ্রান্তিতে বা গ্লানিতে মুখটায় পচন ধরেছে মনে হওয়ার মত অবস্থা হয়ে থাকলেও। এত দ্রুত পরিবর্তনটা ঘটে যে মনে হয় মেঘে ঢাকা কালো আকাশটার কোন লুকানো ফাঁক দিয়ে বুঝি তার মুখে এক ঝলক সোনালী রোদ এসে পড়েছে।

হঠাৎ গান পর্যন্ত গেয়ে ওঠে আনমনে। কারো অর্থপূর্ণ তাকানি নজরে পড়লে একটু হেসে একটা হাই তুলে ব্যাপারটা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

প্রণতি বলে, এইবেলা তবে টাকা দুটো চেয়ে রাখি—আবার কখন মেজাজ ঠিক থাকবে কে জানে!

: কবে আমার মেজাজ বেঠিক হয়েছিল মনে করে বল্ তো ? আমি তো খেয়াল করতে পারছি না !

: মেজাজ তোমার বেঠিক হয়েই থাকে।

: কবে মেজাজ দেখিয়েছি বল্ না ? কি নিয়ে রাগারাগি বকাবকি করেছি ?

সমর একদিন একরকম জোর করেই তাকে একজন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

তখন চলছে রুক্ষতার পালা।

ডাক্তার তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে, বুক পরীক্ষা থেকে রক্তের চাপ নি-জার্ক কিছুই বাদ যায় না।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে। বোঝা যায় চেহারার রূপান্তরের সঙ্গে মন মেজাজ ছাড়া শারীরিক প্রক্রিয়ায় কি কি পরিবর্তন ঘটে সেটা জানাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। শরীরে কোন কষ্ট বা অস্বস্তি বোধ করে কি না, মাথা ধরে কি না, ঝাপসা ছাখে কি না, ঘুম কমবেশী বা হাল্কা বা গাঢ় হয় কি না, খাওয়া বাড়ে কমে কি না, হজমের তফাত হয় কি না ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করার পর ডাক্তার তার একটু রক্ত রেখে দিয়ে জানায় যে এবার চেহারা বদল হলে তাকে আরেকবার আসতে হবে।

সমরের সঙ্গে প্রাণেশ্বর পরদিনই আবার যায়। চব্বিশ ঘণ্টায় তার চোখমুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে ডাক্তারও আশ্চর্য হয়ে যায়। কাল যে মুখ দেখে মনে হয়েছিল জ্বরে ভুগছে কিম্বা রোদে পুড়ে এসেছে, আজ সেই মুখখানা লাবণ্যময়।

সেদিনও ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে, নানা কথা জিজ্ঞাসা করে—একটু রক্ত রেখে দেয়।

: কত দিন এরকম চলছে ?

: ঠিক জানি না। বড় হয়ে খেয়াল করেছি।

সমর বলে, ভয়ানক দুরন্ত ছিল, আগে আমরাও খেয়াল করি নি। আমি প্রায় বছর চারেক লক্ষ্য করছি। ডাক্তার ভাবতে ভাবতে বলে, চার বছর ?

একটা খুব সিরিয়াস প্রশ্ন আছে, ভেবে চিন্তে জবাব দিতে হবে। চার বছরে কমেছে না বেড়েছে?

প্রাণেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, এক রকম আছে।

ডাক্তার ভেবে চিন্তে তার রায় দেয়। ব্যাপারটা স্নায়ুঘটিত কিন্তু কারণটা মানসিক। প্রাণেশ্বর খুব সেন্‌জিটিভ, খুব সেন্টিমেন্টাল, কোন কারণে মন বিগড়ে গেলে স্নায়ুমণ্ডলীর উপর তার জোরালো প্রতিক্রিয়া হয়। চেহারায় তার ছাপ পড়ে, মন-মেজাজ বিগড়ে যায়।

মানুষের যেটাকে ধাত বলা হয়, এটা সেই ধাত দাঁড়িয়ে গেছে। বয়সের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কমে যাবে। জীবনে খুব বড় রকম একটা চেঞ্জ এলেও তাড়াতাড়ি কমে যেতে পারে। বিয়ে করে সংসারী হবার পর হয়তো দেখা যাবে ব্যাপারটা কবে শেষ হয়ে গেছে প্রাণেশ্বর নিজেই টের পায় নি।

প্রাণেশ্বর বলে, বড় রকম চেঞ্জ? বাবা মারা গেলেন, কলেজ ছাড়লাম, সংসারের দায় নিলাম, সব কিছু পাল্টে গেল। সকালে ঘুম ভাঙ্গা থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত। এর চেয়ে বড় চেঞ্জ কী আসতে পারে ডাক্তারবাবু? বিয়ে করা তো ছেলেখেলার ব্যাপার।

ডাক্তার বলে, মোড অফ লাইফে চেঞ্জ এসেছে। কলেজে পড়া, পাশ করা, খেলাধূলো, লভ্‌-মেকিং, হৈ-চৈ করা—এসব দায়ের বদলে সংসারের দায়টা ঘাড়ে চেপেছে। খাওয়া দাওয়া চলাফেরা খেলাধূলো কাজ করার রুটিনটা পাল্টেছে। মন পাল্টায় নি।

বলে হাসিমুখে ডাক্তার আবার অভয় দিয়ে বলে, ভাবনার কি আছে? আগেই তো বললাম এটা নিছক ধাত, আর কিছু নয়। এরকম কত মানুষ আছে, তারা ডাক্তার দেখাবার কথা মনেও আনত না। যেমন রাগী মানুষ—কারণে অকারণে রেগে আগুন হয়ে পাগলের মত করতে থাকে, ওটা কি কেউ রোগ বলে গণ্য করে? সবাই জানে, মানুষটার ওইরকম ধাত।

দু জনে বড়ই অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসে। প্রাণেশ্বর রেগে বলে, ধাত!

রাগী মানুষের যেমন রাগের ধাত, আমার এটাও তেমনি একটা ধাত। কচি খোকা পেয়ে যেন জলের মত বুঝিয়ে দিল!

সমর বলে, রাগিস না। নিজে বোঝে নি, আমাদের বোঝাবে কি? একটা কিছু তো বলতে হবে!—এতগুলি টাকা ফি দিলাম?

: তোমারও যেন টাকা বেশী হয়েছে। মণি-মা কঙ্কণ পরার সাধ মেটাতে চেয়ে ঝগড়া করে পায় না!

: ও বাবা, তুই দেখি আমাদের দাম্পত্য কলহের খবরও রাখিস, মণি-মার পক্ষ নিয়ে চটেও থাকিস! আমার অসুখের খবরটা রাখিস তো?

: রাখি না? আমার দোকানের ওষুধ খাচ্ছ।

: সে কথাই বলছিলাম। এতদিন ওষুধ খাচ্ছি, আরও কয়েক বছর খেয়ে যেতে হবে। কঙ্কণ চাওয়ার সময় তোর মণি-মা এটা হিসাব করে?

: করে বৈকি। যেদিন দরকার পড়বে মণি-মা কঙ্কণ কেন সব গয়না বেচে দেবে না?

প্রাণেশ্বরের মুডের সঙ্গে তার বাচ্চা বয়স থেকেই সমরের পরিচয়। অনেক বাপ নিজের ছেলের মুড বোঝে না। প্রাণেশ্বরের বেয়াদপি সমর গ্রাহ্যও করে না।

ছেলেটাকেই তা হলে ত্যাগ করতে হয়।

প্রায় জন্ম থেকে ছেলের মতই যে এত বড় হয়েছে। নিজের মহাপণ্ডিত সর্বজনমান্য বাপের সঙ্গে কি তর্কই প্রাণেশ্বর জুড়ত, দুর্বিনীত উদ্ধত সমান প্রতিপক্ষের মত বিশ্রী কড়া মন্তব্যের আক্রমণে বাপকে কাবু করার চেষ্টা করত, সে কথা সমর ভুলতে পারে না।

রামনাথ যে কোনদিন ধৈর্য হারায় নি, রাগ করে নি, তাও তার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে।

দুটো স্টপেজ আগে পরে তাদের বাস থেকে ওঠা-নামা। নিজের বাড়ির স্টপেজে না নেমে তার সঙ্গে চলেছে দেখে সমর জিজ্ঞাসা করে, বাড়ি যাবি না?

: মণিমা আমায় খেতে বলেছে।

: তোকে খাইয়ে খাইয়েই তোর মণি-মা আমায় ফতুর করল, সাধে কি একজোড়া কঙ্কণ দিতে পারি না।

প্রাণেশ্বর হঠাৎ খুশী হয়ে একগাল হাসে। উচু হয়ে বাস থামাবার ঘণ্টা বাজায়। বাস থেকে নেমে চলতে চলতে বলে, ভেবো না মণি-কাকু। মণি-মার কঙ্কণের সাধ আমি মেটাব।

: তুই মেটাবি মানে?

: অত খবরে তোমার দরকার কি? দু চারদিনের মধ্যে আমি মণি-মার হাতে কঙ্কণ পরাব। বুঝতে পার না মণি-মার এটা কীরকম সাধ? ইন্দ্রানী বড় হচ্ছে। মণি-মা নিজে বুড়িয়ে যাচ্ছে, শাড়ি কাপড় গয়নাগাঁটির পালা তো এবার চুকল। আমি দেখাব মণি-মা কদিন কঙ্কণ হাতে রাখে—একমাসের মধ্যে খুলে ফেলে যদি হাঁফ না ছাড়ে তো আমার নাম প্রাণেশ্বর নয়।

গলির মোড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সমর জিজ্ঞাসা করে, সে তো বুঝলাম, কিন্তু কঙ্কণ তুই পাবি কোথায়?

প্রাণেশ্বর হেসে বলে, না জেনে ছাড়বে না? মার একজোড়া কঙ্কণ আছে। রঙ্‌ করে পালিশ করে এনে দেব।

প্রাণেশ্বরকে বড়ই অন্যমনস্ক মনে হয়। কি এক গভীর ভাবনায় সে যেন ডুবে গেছে। নিজের মার পুরানো কঙ্কন রঙ পালিশ করে মণি-মাকে পরাবার ভাবনা যে নয়, সমর তা জানত।

সে চুপ করে থাকে।

মণিমালাও খানিকক্ষণ নীরবে পরিবেশন করে যায়। ইন্দ্রানী স্কুলে গেছে। আগামী মাঝ-বছরী পরীক্ষা নিয়ে সে বড়ই ব্যতিব্যস্ত—নাচের স্কুলে যেতে পর্যন্ত আপত্তি করে।

যা দিচ্ছে প্রাণেশ্বর একমনে খেয়ে যাচ্ছে। ডাল খাচ্ছে না তরকারী খাচ্ছে কিছুই যেন তার খেয়াল নেই।

গা জলে যায় মণিমালার। মাংস রাঁধা এল্যুমিনিয়ামের হাঁড়িটা এনে সামনে নামিয়ে কড়া ঝাঁঝাঁলো স্বরে জিজ্ঞাসা করে, মাংস খাবি তো প্রাণেশ ?

প্রাণেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, তোমার রান্না মাংস খেতেই তো এসেছি মণি-মা। হোটেলের বাবুর্চিদের তুমি হার মানিয়েছ। ওদের মাংসে শুধু মশলার ফায়দা। মাংস নয়, যেন মশলা খাচ্ছি। তোমার রান্না মাংস খেলে মনে হয় যেন সত্যিকার মাংস খাচ্ছি।

: কী কায়দায় কথা বলতেই তুই শিখেছিস প্রাণেশ! আমার ভাল লাগে না।

প্রাণেশ্বর মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত মাখে—কিন্তু সেটা পড়েই থাকে। দু এক টুকরা মাংস মুখে দিয়ে সে বলে, মেটুলি দাও না মণি-মা ?

হাতা দিয়ে মাংসের হাঁড়িতে মেটুলি খুঁজতে খুঁজতে মণিমালা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, এক হয়েছিস্ তুই, আরেক হয়েছে ওই মেয়ে। কী যে আমি করব তোদের নিয়ে।

মণিমালার এই আপসোস প্রকাশের ক্ষণটাই যেন প্রাণেশ্বর বেছে নেয় তার নিজের প্রাণের আপসোস প্রকাশের জন্য।

সমরকে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, মানসিক কারণ মানে কি ? এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম। কাল পরশু নতুন কিছুই ঘটে নি যাতে মনটা বিগড়ে যেতে পারে। খেয়েছি, দোকানে গেছি, ওষুধ বানিয়েছি, বাড়ি ফিরেছি—

সমর উদ্গার তুলে বলে, ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা ?

প্রাণেশ্বর যেন ঝিমিয়ে যায়।

মণিমালা গলা চড়িয়ে ধমক দেয়, খেতে বসেছিস, না আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছিস প্রাণেশ ? ওসব কথা পরেই নয় হবে ? খেতে বসেছিস, খাওয়ার দিকে মন দে। সারাদিন সারারাত অন্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাস্, কে বারণ করবে।

প্রাণেশ্বর নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে। মাংস ভাত খেতে খেতে বলে, পরোটা করে দেবে মণিমা ? ভাত দিয়ে মাংস ভাল লাগছে না। মোটা হলে দুটো, পাতলা হলে চারটে পরোটা করে দাও।

৪

মণিমালার প্রাণের জ্বালা প্রাণেশ্বর কি আর বোঝে না।

এই নিয়ে তার প্রাণেও কি কম জ্বালা!

দুটি মায়ের আদর সে ভোগ করে।

ও বাড়িতে সরলার, এ বাড়িতে মণিমালার।

সরলার পেটে সে জন্মেছে। সরলা তাকে জন্ম দিয়েছে প্রসবের দায় পালন করে।

সে-ই তার নিয়ম-সঙ্গত আইন-সঙ্গত আসল মা।

আরেকটা মা সে পেয়েছে—মণিমালা।

সরলার চেয়ে মণিমালার স্নেহমমতার রকমটা অনেক বেশী গভীর আর বিচিত্র হোক, সরলার সাদাসিধে মোটা স্নেহমমতা তুচ্ছ করার কথা প্রাণেশ্বর কল্পনা করতে পারে না।

তার মানেই দাঁড়ায় যে তার জীবনে দু'জন মায়ের স্নেহ মায়া আদর যত্নকে মেনে নিতে হবে।

প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে প্রাণেশ্বরের পক্ষে।

অথচ কত ছেলে একটা মায়ের স্নেহ মায়ার স্বাদও পায় না। যেমন চপল। দশ মাস তাকে পেটে ধরতে পেরেছিল, জন্ম দিতে গিয়ে মরে গেল।

মণিমালা অবশ্য মায়ের মতই পালন করে এসেছে চপলকে। কেউ অভিযোগ করতে পারবে না যে বাপ মারা যাওয়ার পর ভাইটাকে পালন করা এবং মানুষ করার জন্য দুই বড় ভায়ের টাকা পাঠানো বছরখানেকের মধ্যে অনিয়মিত হয়ে গিয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মণিমালা কোনদিন চপলকে অনাদর অবহেলা জানিয়েছে।

তবু প্রাণেশ্বরের বরাবর মনে হয়েছে, মায়ের পেটের ভাই চপলের চেয়ে পরের ছেলে তার জন্য দরদ অনেক বেশী—এবং অনেক বেশী খাঁটিও বটে।

আজও তাই।

চপল যে বিগড়ে গেছে, বদ বন্ধুদের সঙ্গে মিশে বদ খেয়ালে মেতেছে, মুণিমালার হাতবাক্স কৌশলে খুলে সংসার খরচের টাকা পর্যন্ত বাগিয়ে নিয়ে দু'চার দিন বাইরে কাটিয়ে আসতে শিখেছে — সেজন্য মণিমালার দুঃখ যেন মর্মান্তিক নয়।

চপল বিগড়ে গেছে, উপায় কি ?

সে বিগড়ে যাক, চুলোয় যাক, সেজন্য মণিমালার যেন তত বেশী আপশোষ নেই।

তার দিবারাত্রির দুশ্চিন্তা এই যে, একগুঁয়ে প্রাণেশ্বর যেন পরের শেখানো ছেলেমানুষী প্রাণের জ্বালায় না বিগড়ে যায়।

আর এদিকে রূপের গর্বে যেন না বিগড়ে যায় ইন্দ্রাণী।

রূপের গর্ব সত্যিই মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রাণীর পক্ষে।

ছেলেমানুষ। জগৎ সংসারের চালচলনের ব্যাপার কিছু মানেও না, বোঝেও না।

রূপ যে কি সর্বনাশ আনতে পারে সে বিষয়ে কোন ধারণাই নেই।

মণিমালা তাকে উপদেশ দেয়, বুঝিয়ে শুনিয়ে সাবধান করার চেষ্টা করে।

এতটুকু সংসার, মানুষ আর ক'জন।

কিন্তু মণিমালার অশান্তির যেন সীমা নেই। অন্য কারো কাছে সে কিন্তু প্রাণের জ্বালা প্রকাশ করে না—একমাত্র প্রাণেশ্বর ছাড়া।

প্রাণেশ্বর ছাড়া মণিমালার যেন আর কোন অবলম্বন নেই। প্রাণেশ্বরই তার একমাত্র ভরসা।

প্রাণেশ্বরের সঙ্গে মণিমালা প্রায় কাতর স্বরে তার প্রাণের চিন্তাভাবনা উদ্বেগ সম্পর্কে কথা বলে।

: সময় করে রোজ তুই একবার আসবি প্রাণেশ।

: কেন ?

: আমাকে বাঁচাবার জন্য।

: ওরে বাবা, তবেই আমি গেছি। তোমাকে বাঁচাবার দায় নিতে হবে?

: হ্যাঁ, দায় নিতে হবে। তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও আসবি। ক্যাস বাক্সে না রেখে ট্রাঙ্কে রেখেছিলাম সংসার খরচের টাকাটা। বাক্স ভেঙ্গে টাকাটা নিয়ে চপল পালিয়ে গেছে। অশান্তিতে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। মণি-মা গলায় দড়ি দেবে না—এটা যদি ঠেকাতে চাস, রোজ একবার আসিস্।

: রোজ আসব আর রোজ জোর করে সস্তা পচা ঘিয়ের লুচি খাইয়ে আমার দফা নিকেশ করবে তো?

: তোর জন্য আট টাকা সেরের খাঁটি গাওয়া ঘি রেখেছি।

: না রাখলেই পারতে? আমায় দুটো সিম সেদ্ধ করে দিলেই ফুরিয়ে যেত?

এটা গুরুতর নালিশের কথা। মণিমালা প্রাণ দিয়ে তাকে আদর করে কিন্তু সে আদর তার সইছে না। আদর হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যাচার।

মণিমালা খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে বলে, তোর কথাও বুঝি নে, তোর রুচিও বুঝি নে। আমরা তো খেয়ে দেখলাম, চমৎকার খাঁটি ঘি।

প্রাণেশ্বর হেসে বলে, ভারি সুন্দর গন্ধ, না মণি-মা? তাতেই মন ভুলে যায়। রঙটাও খাঁটি। কাজেই আর কথা কি।

মণিমালাও এবার হাসে।

: তাই তো বলছিলাম। কিভাবে হিসাব কষব, রোজ এসে বুঝিয়ে দিয়ে যাবি।

ইন্দ্রাণী পড়ছে।

খুব সকালে উঠেই নাকি পড়া শুরু করেছে।

পড়ার জন্য বিশেষ ঘরের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে ঘরে ইন্দ্রাণীকে পাওয়া যায় না। তিনতলার ছাতে উঠে দেখা যায়, একটা বই হাতে নিয়ে সে চরকীর মত সারা ছাতে ঘুরপাক খাচ্ছে।

প্রাণেশ্বর ছাতে আসায় সে যেন বিরক্ত হয়।

প্রাণেশ্বর বলে, ভয় নেই, চলে যাচ্ছি। পড়ায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে পরীক্ষায় ফেল করাব না। পড়াটা হজম হচ্ছে না বুঝি?

বইটা ছাতে আছড়ে ফেলে দিয়ে তার কাছে এসে ইন্দ্রাণী বলে, ত্যাখো না কাণ্ডটা। বেশ পড়িয়ে আসছিলেন, ঠিক পরীক্ষার আগে মাস্টার মশায়ের হল জ্বর। আমাকে ডোবানোর ফিকির আর কি। ছেলে এসেছিল মাইনের টাকা নিতে, বলে দিয়েছি, মাস্টারমশাই নিজে না এলে মাইনে দেব না।

: জ্বর হয়েছে, আসবেন কি করে?

: দু'তিন বছর পড়াচ্ছেন, একদিন একটু সর্দি কাসি পর্যন্ত হয় নি, আমার আসল পরীক্ষার আগে জ্বর হবে কেন? এসব অজুহাত হল আমাকে ফেল করাবার ফিকির।

প্রাণেশ্বর হেসে বলে, তোকে ফেল করিয়ে মাস্টারমশায়ের লাভ কি হবে?

: আমাকে আরেক বছর পড়িয়ে মাইনে আদায় করবে।

প্রাণেশ্বরের হাসির শব্দ একতলায় শোনা যায়।

হাসির ধমক সামলে নিয়ে সে কিন্তু কথা বলে গম্ভীর হয়েই। বলে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওরকম মতলব কেউ করে? সারা বছর পড়িয়ে এসেছেন—এখন পরীক্ষায় পাশ করা ফেল করা তোর নিজের ব্যাপার। তারপর সে যোগ দেয়, পাশ করে যাবি—ভাবিস না। বেশী ভাবলেই বরং মাথা গুলিয়ে যাবে।

শুধু কথাগুলি নয়, কথা বলার ভঙ্গিটাও তার হয় বয়স্ক গুরুজনের মত।

৫

চপলের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বনিবনা নেই। মামা বলে মানতে চায় না, সব সময় খোঁচা দিয়ে সমালোচনা করে কথা বলে।

চপল রাগে না।

মুখে মৃদু একটু হাসি ফুটিয়ে তাকে যেন জানিয়ে দেয়—তোর কথা শুনছি কিন্তু মানছি না, এসব ছেলেমানুষী প্রলাপ।

ইন্দ্রাণী বিশ্রী সুরে বলে, তোমার মত এমন একটি মামা কেন জুটল আমার? আমার ঘেন্না করে।

চপল তার জবাবে বলে, পেট ভরে ভাত খেয়ে নিজের শরীরটা ঠিক রাখিস। মামা নিয়ে মেয়েদের চলার দিনকাল কেটে গেছে।

সবাই বলে, সবাই মানে অবশ্য ঘর-সংরারী আত্মীয় স্বজন, যে চপল সত্যিই বখাটে হয়ে গেছে।

পড়াশোনায় মন নেই। সারাদিন টো টো কোম্পানী করে কোথায় কাদের সাথে আড্ডা মারে আর ঘুরে বেড়ায় সে খবর একমাত্র সে নিজেই কেবল জানে।

নেশা-টেশা করে কিনা এখনও টের পাওয়া যায় নি—যদি অবশ্য সিগ্রেটের ধোঁয়া টানাকে নেশার পর্যায়ে না ধরা হয়।

ওটা চপল চালায় ভালমতই।

পরীক্ষায় ফেল করে সে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। প্রথমে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে গিয়ে অভদ্র ভাষায় পাশ-করানো ফেল-করানোর মালিকদের গালাগালি করে, তারপর জুড়িয়ে গিয়ে তুচ্ছ করে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় ব্যাপারটা।

যেন কিছুই আসে যায় না সারা বছর অন্তের পয়সা খরচ করে পড়া চালিয়ে গিয়ে খেটেখুটে তৈরী হবার বদলে শেষ পরীক্ষায় ফেল করলে।

কে অস্বীকার করবে যে মানুষের জীবনে ঢের ঢের বড় বড় পরীক্ষায় পাশফেলের সমস্যা আছে।

মিছে তবে স্কুল-কলেজে পড়া কেন?

বখাটে ছেলেদের গতানুগতিক জবাব মেলে না চপলের কাছে, যে গুরুজনেরা গায়ের জোরে একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্ট ছাত্রদের ফেল করালে, ফেল না করে উপায় কি!

সে বলে, একটা পরীক্ষা দরকার তো যে একজনের পরীক্ষা পাশের ধাত আছে কি না? সেটা জানা হলেই পাশ ফেলের ঝন্‌ঝাটের ব্যাপারটা ফুরিয়ে গেল।

ঃ ছেলেটার দফাও ফুরিয়ে গেল।

ঃ ফেল করলেই সব ফুরিয়ে যায় নাকি!

সত্যই বখাটে হয়ে গেছে বৈকি ছেলেটা!

মণিমালার ম্লান মুখ আর ছল-ছল চোখ বেশীক্ষণ বুঝি তার সয় না, বাইরে রোয়াকে বসে গোটাকয়েক বিড়ি সিগ্রেট টেনে এসে মণিমালার চোখমুখের ভাব তেমনি আছে দেখে বলে, এটাই তোর মস্ত দোষ দিদি—বিশ্রী দোষ। ফেল করেছি আমি, কান্না আসছে তোর।

ঃ ছ্যাবলামি করিস নে চপল।

ঃ শুনবে তবে? ফেল করেছি, বেশ করেছি, ভাল করেছি। ফেল করেই আমি খুশী হয়েছি, পাশ করলে লজ্জা পেতাম। কত পার্সেণ্ট পাশ করেছে জানো না? বেশীর ভাগ ফেল করেছে। বেশীর ভাগের সঙ্গে থাকাই ভালো। কি বলো প্রাণেশদা, তাই ভালো নয়?

ভোরে পাড়ার এক বাড়িতে খবরের কাগজে ছাপা পাশের তালিকার চপলের নাম না দেখে ডিপেন্‌সারীতে যাবার পথে প্রাণেশ্বর ব্যাপার বুঝতে এবং দরকার হলে মণিমালাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে সামলাতে এসেছিল।

সে গম্ভীর মুখে বলে, ফেল করেছ সেজন্য নয়। পাশ অনেকেই করতে পারে নি, মোট কথা হল এই যে হাল্‌কাভাবে নিয়ে হেসে উড়িয়ে দিও না ব্যাপারটা।

ইন্দ্রাণী ঝংকার দিয়ে বলে, সারা বছর পড়ার খরচ যারা যোগান দেয়, তাদের কথা মনে আছে তো মামা? সারা বছর যারা টাইমের ভাত রেঁধে দেয়, জল-খাবার তৈরী রাখে, তাদের কথা নয় মনে নাই রাখলে!

চপল কি সহজ বখাটে হয়েছে!

সে হেসে বলে, পড়ার টাকা যারা দেয়, তোর বিয়ের সময় দরকার হলে

তারাই দু'চার হাজার দেবে! আমি মানা করে দিলে কিন্তু দেবে না! কাজেই আমায় চটাস নে।

: ওঃ, বুঝেছি ব্যাপার—তুমি পড়ার মজা চালিয়ে যেতে চাও। পাশ ফেলের চিন্তা তোমার নেই।

: পাশ করার চেষ্টা কি করি নি আমি?—ঢের করেছি। তবু ফেল হয়ে গেলাম, উপায় কি!

মণিমালার কাঁদো-কাঁদো ভাবটা হঠাৎ কেটে যায়। সে বিষম রকম রেগে গিয়ে বলে, চেষ্টা করেছিস? বলতে লজ্জা করল না তোর? সারাদিন আড্ডা মেরে বেড়াস, তুই চেষ্টা করেছিস পরীক্ষা পাশ করার? ও বাড়ির শচীন বুঝি বিনা চেষ্টায় পাশ করে গেছে?

চপল শুধু বলে, রেগো না, রেগো না। রাগলে শুধু রাগারাগিই হয়, কোন কথার মীমাংসা হয় না, মানে বোঝা যায় না।

মণিমালা আরও রেগে বলে, রাগব না? ভোর রাত্রে উঠে উনান ধরিয়েছি তোর পড়া চালাবার খাবার দিতে, তোর কলেজের ভাত রাঁধতে। উনি যা খেয়ে আপিস যান, আমি তা এক ঘণ্টায় রেঁধে দিতে পারি। আটটায় উঠে উনান ধরালে আমার চলে।

চপল বলে, এসব তো জানাই আছে আমার! আমি কি কোনদিন বলেছি আমার জন্য তুমি কিছু কর নি, কেউ কিছু করে নি? কিন্তু আমার নিজের দিকটাও তো আছে।

: তোকে মানুষ করতেই আমার আদ্দেক প্রাণ বেরিয়ে গেছে, সে হিসেবটা রাখিস?

: বললাম তো ওসব আমার জানা আছে।

মণিমালা একেবারে যেন জুড়িয়ে গিয়ে মস্ত একটা হাই তোলে, তারপর ধীরে ধীরে বলে, ছাই জানা আছে—জানা থাকলে কি এত সাজিয়ে গুছিয়ে কায়দা করে এত মিছে কথা তুই বলতে পারতি? তোর কলেজের ভাত রাঁধতে ভোর বেলা উঠে আমি শচীনকে আলো জ্বেলে পড়তে দেখেছি, পড়তে শুনেছি—রাত

এগারটায় শুতে যাবার আগেও দেখেছি। তুই চেষ্টা করেছিস পরীক্ষা পাশ করার ? শচীন এত ভাল ভাবে পাশ করে গেল, নিজে তুই ফেল করে গেলি, তবুও আমাকে তুই মুখের কথায় ধোঁকা দিবি ? পাশ করার চেষ্টা করেও ফেল করেছিস বিশ্বাস করাবি ?

মণিমালা পাশের বাড়ির শচীনের কথা তোলামাত্র সকলের কেমন যেন একটা ভাবান্তর আসে।

প্রাণেশ্বর একটা কথা বলে না।

ইন্দ্রাণী মুখ বুজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

গায়ের মোটা কাপড়ের জহর-কোটটা খুলে চপলও যেন বোবার মত শুধু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে।

এত তেজী এত রাগী এত যুক্তিময়ী মণিমালা তখন নতি স্বীকার করে অতি-বৃদ্ধা সেকেলে দিদিমার মত করুণ জড়ানো সুরে জিজ্ঞাসা করে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না তোদের ভাবসাব। আমায় তোরা বলবি না ব্যাপারটা ?

প্রাণেশ্বর মুখ তুলে মণিমালার চোখে চোখে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে, শেষ পর্যন্ত তোমায় না জানিয়ে কি উপায় থাকবে, না রেহাই থাকবে ? ব্যাপারটা খুব গুরুতর মণিমা। তোমাকে হঠাৎ জানাতে চাই নি।

মণিমালা আবার রেগে গিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি বল্ তো কি হয়েছে। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করিস নে।

: শচীন কাল রাতে হাসপাতালে মারা গেছে।

মণিমালা খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকে।

: কি হয়েছিল ?

: টি. বি.। ওরা গোপন করেছে, পাড়ায় তোমাদের সকলকে জানিয়েছে যে পুরীতে বেড়াতে গেছে। গিয়েছিল হাসপাতালে। ভালভাবে পাশ করেছে এ খবরটাও নাকি শুনতে পায় নি। খবরটা যখন পৌছাল তখন শেষ হয়ে গেছে।

চপল বাঁ হাতের মুঠি পাকিয়ে সজোরে এবং সশব্দে ডান হাতের তালুতে ঘুষি

মেরে বলে, পাশ করে মরার চেয়ে ফেল করে বেঁচে থাকা ঢের ঢের ভালো। তোমরা আর পড়াবে না জানি। না পড়ালে—পড়ার চেয়ে বাঁচাটা আমার কাছে বড় কথা।

পরীক্ষায় ফেল করা বখাটে ছেলে, কিন্তু কি তার তেজ।

শুধু কথায় নয়, চেহারাতেও।

তেল-তেলা লাবণ্য মুখে পর্যন্ত নেই, মুখ দেখলে মনে হয় কয়েক ঘণ্টা রোদে পুড়ে পুড়ে রাস্তা মেরামতের কুলির খাটুনিই বুঝি খেটে এসেছে—কিন্তু তার শক্ত পুষ্ট দেহটা যেন পেশাদার ক্রিকেট-ফুটবল খেলোয়াড়ের সুন্দর বেশীবহুল চেহারার মতই আশ্চর্য রকম সুন্দর দেখায়।

ডিস্‌পেন্‌সারী খুলতে হবে।

প্রাণেশ্বর গা তোলে।

ভাই-এর জন্য সঞ্চিত প্রাণের জ্বালা গায়ের রাগ যেন তার উপরে ঝাড়বার জন্যই মণিমালা হুকুম দেয়, এত তোর তাড়া কিসের? এখুনি আসছি, পাঁচ মিনিট বসে যা প্রাণেশ।

রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে কেবল তার জন্যই যেন লুচি ভাজবে এমনি ভাবে মণিমালা বলে, লুচি খেয়ে যা। কড়াই চড়িয়ে এসেছি—দেরি হবে না। ভাজা-ভুজি হবে না কিন্তু, বাসি দম দিয়ে খাবি।

পাশাপাশি বসে দু'জনের আলুর দম দিয়ে লুচি খাবার রকম দেখে মণি-মালার মনে কি ভাব জাগে সে-ই জানে।

মুখ দেখে মনে হয় তার প্রাণের জ্বালা দেহের রাগ মন্ত্রবলে জুড়িয়ে যেন দরদ হয়ে গেছে।

চপল এগারটা টাটকা ভাজা লুচি খায়—কি ঘিয়ে ভাজা সেটা যে তার খেয়ালেও আসে না তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

প্রাণেশ্বর তিনখানা লুচি খুঁটে খুঁটে খেয়ে উদ্গার তোলে।

মিনতি আর জিদ মেশানো সুরে বলে, আমাকে আর খাওয়াবার চেষ্টা করো না মণিমা।

: না খেয়ে মরবি।

: আর বেশী খেলেই বরং মরব—যন্ত্রণার শেষ থাকবে না।

চপল আরও দু'খানা লুচি চেয়ে নিয়ে দমের অভাবে চিনি দিয়ে খেতে খেতে বলে, তুই না সারাদিন খাটিস ? এই খেয়ে খাটিস ?

কাঁচের গেলাস থেকে এক ঢোঁক জল গিলে প্রাণেশ্বর জবাব দেয়, তোর মত মজা করে দিন কাটাই না তো !

: দিনরাত খাটিস্ ?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রাণেশ্বর বলে, তা দিয়ে তোর দরকার কি ? আমার খাটুনির হিসাব তোর কাছে আমি পেশ করব না।

: কেন ? লুকোচুরি ব্যাপার ?

: লুকোচুরি হতে যাবে কেন ?

: লুকোচুরি ব্যাপার না হলে খাটুনির খবর সোজাসুজি মানুষকে জানাতে আপত্তি কি ?

: কিছুই আপত্তি নেই। তবে তুই জানতে চাইলেই সব তোকে জানাতে হবে সেটা আমি মানতে রাজী নই। কর্তালি একটু কম কর। সংসারে এক পয়সা খরচ দিস না, দিব্যি এতগুলো লুচি পেটে পুরলি। তোর লজ্জা করে না !

মণিমালা রেগে চীৎকার করে বলে, চুপ কর, চুপ কর দু'জনে। যে মুখ খুলবে তার গালে আমি চড় কষিয়ে দেব।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করে, ওর কাছে হিসেব পেশ না করিস, আমায় তো বলবি ? তোর খাওয়া দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন রে ?

প্রাণেশ্বর আরেকখানা লুচি চেয়ে নিয়ে চপলের মত চিনি দিয়ে খেতে খেতে বলে, তুমিও একথা জিজ্ঞাসা করবে মণিমা ? আমার চিন্তাভাবনার খবর তুমি রাখো না ?

মণিমালা বলে, রাখি বৈকি। কিন্তু চিন্তা-জ্বর কাবু করবে বুড়োদের। এই বয়সে চিন্তায় ভাবনায় তুই কেন কাবু হবি ?

প্রাণেশ্বর শুধু একটু হাসে। শুধু যে ফাঁকা চিন্তাভাবনা নয়, বাস্তব অবস্থার

চাপটা কি ভীষণ—সে বিষয়ে মণিমালার ধারণা নেই, কল্পনাশক্তির সাহায্যে একটা ধারণা গড়ে তোলার সাধ্যও নেই।

চপল না হয় বখাটে হয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণীর কি হয়েছে ?

সে কেন দিন দিন এরকম রোগা হয়ে শুকিয়ে গিয়ে সিটে বনে যাচ্ছে। কারণ কি ?

বয়েসকালের মেয়েলি অসুখ ?

নাচের ক্লাশে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করেছে।

এ বিষয়ে মণিমালাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে প্রাণেশ্বর সঙ্কোচ বোধ করে। রাত দশটায় ডিসপেন্সারী গুটিয়ে মণিমালার নিমন্ত্রণ রাখতে এসে ইন্দ্রাণীকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, এমন চেহারা হচ্ছে কেন ?

ইন্দ্রাণী জবাবে বলে, নিজের চেহারা আয়নায় দেখেছ ? তোমার এমন চেহারা হচ্ছে কেন ?

প্রাণেশ্বর কড়া সুরেই বলে, আমার চেহারা যেমন হোক, চলে যাবে। লোকে আমার কাজ দেখবে, চেহারা দেখবে না। রোগা হয়ে যাচ্ছি বলে একটু হয়তো আপশোষ করবে, দু'টো সন্দেশ খাইয়ে মোটা করে দিতে চাইবে। তুই না সিনেমা স্টার হবি ? জগৎ সংসারকে চমক লাগিয়ে দিবি ? এরকম রোগা শুঁটকো মেয়েকে সিনেমার লোকেরা নেবে ?

ইন্দ্রাণী আপন মনে চুলের জড় ছাড়ায়। চুল উঠে যাচ্ছে, গোছ কমে গেছে, তবু এখনো হাটুর কাছে নেমেছে চুলের গোছা।

: মরে গেলেও সিনেমায় আমি যাব না প্রাণেশদা।

প্রাণেশ্বর খানিকক্ষণ কথা খুঁজে না পেয়ে একদৃষ্টে তার দিকে বাক্যহারা বোকার মত চেয়ে থাকে।

: মতিগতি বদলে গেল কেন রে ?

: ছি ছি, এই সিনেমায় মানুষ যায়। মেয়েদের কথাই বলছি। কি ভাবে আসে, কি রকম ভঙ্গি করে—ঠিক যেন রঙকরা খেলনা পুতুল।

: খেলনা পুতুলের মত চেহারাটা তো বজায় রেখেছে? তোরও তো খেলনা পুতুলের মত চেহারা ছিল। রঙ উঠে মুখে চল্‌টা পড়ে কি চেহারা দাঁড়িয়েছে আয়নায় দেখিস না?

: দেখি না? কি বলছ তুমি পাগলের মত! রোজ দশবার দেখি। কোন মেয়ে দিনে অন্তত দু'তিনবার আয়নায় নিজের মুখ ত্থাখে না, রূপ ত্থাখে না— এমন মেয়ের কথা ভাবতে পার?

: পারি বৈকি। সতীদি এগার বছর চুলে তেল দেয় না, চুল বাঁধে না, রঙীন শাড়ী পরে না, আয়নায় মুখ ত্থাখে না—

: সতীদির সঙ্গে আমার তুলনা করছ?

: কেন তুলনা করব না? তুই যে সতীদি'র চেয়ে মহা-মানবী তার কোন প্রমাণ দেখিয়েছিস্‌?

: ও বাবা, তোমার এই হিসেব আমাদের দফা সেরেছে!

প্রাণেশ্বর চুপ করে থাকে।

ইন্দ্রাণীও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আমার কি হয়েছে আজকেই জানবার বুঝবার জন্য পীড়াপিড়ি কোরো না, মনটা ঠিক করে নেবার জন্য একটু সময় দাও। দু'এক দিনের মধ্যে আমি নিজে গিয়ে সব তোমায় বলব প্রাণেশদা।

একদিনের সময় চেয়ে নিয়েছিল কিন্তু প্রাণের নিগূঢ় কথা প্রাণেশ্বরকে জানাবার তাগিদে সেই দিনই বেলা একটা নাগাদ ইন্দ্রাণী কলেজের বই খাতা হাতে ওষুধের দোকানে গিয়ে একটু জব্দ হয়ে যায়।

তার ধারণা ছিল, দুপুর বেলা এখন প্রাণেশ্বরকে ডিস্‌পেন্‌সারীতে একা পাওয়া যাবে। ভাগে দোকানটা দেওয়া হয়ে থাকলেও শ্যামাদাস হল ডাক্তার, প্রাণেশ্বর কম্পাউণ্ডার।

দোকান দেখার দায় প্রাণেশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে শ্যামাদাস নিশ্চয় দুপুর বেলাটা বাড়িতে আরাম ক'রে বিশ্রাম করে।

রুগ্না একটি বৌ বেঞ্চের কোণায় বসে ধুঁকছিল। পরনে শুধু একটা ছেঁড়া

নোংরা শাড়ী—চওড়া লাল পাড়টা এককালে যে খুব উজ্জ্বল ছিল সেটা এখনও টের পাওয়া যায়।

কোলে একটা কঙ্কালসার ছেলে!

চার-পাঁচ বছর বয়স হবে, মায়ের মাইটা মুখে নিয়ে ঝিমিয়ে আছে।

একটা মিকশ্চার তৈরি করতে করতে শ্যামাদাস বলে, আয় ইঁদুরাণি, বোস্। প্রাণেশ খেতে গেছে, এখুনি এসে পড়বে।

ছেলের জন্য তৈরী করা শিশিভরা লাল টুকটুকে ওষুধ নিয়ে ইন্দ্রাণীর অজানা অচেনা বৌটি চলে যাবার পর শ্যামাদাস গম্ভীর হয়ে বলে, এই চেহারা নিয়ে ডাক্তারখানায় আসতে নেই, অন্য রোগীরা ভয় পেয়ে যাবে।

ইন্দ্রাণী চটে গিয়ে বলে, সবাই মিলে তামাসা জুড়েছ কেন? দেখে ভয় পাবার মত চেহারা হয়েছে নাকি আমার!

শ্যামাদাস জোর দিয়ে বলে, হয়েছে বৈকি। মুখের সাদাটে ভাব দেখলে মনে হয় গায়ে যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই। বাঁশবনের ফ্যাকাশে সাদাটে পেত্নী যেন বেরিয়ে এসেছিস। রোগীরা ভাববে আমি চিকিৎসা করে রোগ সারাতে পারছি না, তাই তোর এই দশা। ভড়কে গিয়ে আমার কাছে আর আসবে না।

এবার ইন্দ্রাণী হেসে ফেলে।

শ্যামাদাস পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, এখনো তবে হাসতে পারিস্? তা'হলে খানিকটা আশা আছে—চিকিৎসা করালে সেরে যাবি।

: আমার কোন রোগ নেই—কিসের চিকিৎসা করাব?

: রোগ নেই? সে তো আরও ভয়ানক কথা রে! রোগ হলে ডাক্তার কবরেজ তবু ওষুধপত্র দিয়ে রোগটা সারাবার চেষ্টা করতে পারে—বিনা রোগে কেউ এমন শুঁটকি বনে যেতে থাকলে সে চেষ্টা করারও উপায় নেই। বিনা রোগে রোগা হওয়া—এ হল সব রোগের সেরা রোগ।

তার কি হয়েছে, কেন সে এমন ভাবে রোগা হয়ে যাচ্ছে, প্রাণেশ্বরকে

খোলাখুলি জানাবার ঝোঁক নিয়ে এসেছিল বলেই কি ইন্দ্রাণীর আজ রোখ চাপে শ্যামাপ্রসাদকেই সব জানিয়ে দিতে?

বাপ মা ব্যাকুল হয়ে পর পর কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে—তাদের কাছে যে কথা ভুলেও ফাঁস করে নি, আজ সে শ্যামাদাসকে সেই কথাটা জানিয়ে দেয়!

: বলব তোমাকে ডাক্তার-কাকু?

: বলাই তো উচিত।

: মুশকিলে ফেলবে না তো শেষকালে?

: মুশকিলে ফেলব কি রে? দশজনের মুশকিল আসান করাটাই তো হল আমার পেশা!

: বলি তবে, অ্যাঁ?

: বল্ না শুনি। শুনবার জন্যেই তো কান পেতে আছি। আমি নিজে না পারি, আমার জানা কোন ডাক্তারকে দিয়ে—

ইন্দ্রাণী যেন আঁতকে ওঠে।

: তা হলে বলব না! আগে থেকে জানিয়ে রাখছি কোন রকম ওষুধপত্র খেতে পারব না আমি।

শ্যামাদাস বলে, অঃ।

খানিকক্ষণ দাড়ি চুলকে কয়েকবার মা-য়ের নাম উচ্চারণ করে। তারপর সে ভারি মিষ্টি আর নরম সুরে বলে, বেশ, শুধু এইটুকু আমায় বল—রোগ ব্যারাম কিছু নেই, তবু লোকে শখ করে কত রকম ওষুধ খায়। ওষুধ খেতে তোর আপত্তি কেন?

ইন্দ্রাণী একটু ক্ষীণ হাসি হাসে।

বড়ই ম্লান আর করুণ দেখায় তার সেই হাসিটা।

: অত বোকা পাওনি আমাকে—তা হলেই তো আসল কথা বলা হয়ে যাবে। তুমি গিয়ে মা-বাবাকে জানাবে, বাবা ডাক্তারকে জানিয়ে ওষুধ আনিয়ে জোর করে গেলাবে।

শ্যামাদাস আবার বলে, অঃ!

আবার খানিকক্ষণ দাড়ি চুলকে বলে, ইঁদুরাণী আমি মায়ের ভক্ত জানিস তো? মায়ের নামে দিব্যি গাল্‌ছি, তুই যা বলবি, কান দিয়ে শুধু শুনব। কারো কাছে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করব না।

বিব্রতা অভিভূতা ইন্দ্রাণী বলে, বাঃ রে, দিব্যি না গাললেও তোমার কথা বিশ্বাস করতাম। আসল ব্যাপারটা কি জানো ডাক্তারকাকু—

শ্যামাদাস তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে, একটু থাম্‌। কী সর্তে কাউকে বলব না সেটুকু আগে শুনে নে। শেষকালে বলবি তো যে ডাক্তারকাকু দিব্যি গালে কিন্তু দিব্যি পালে না। ধর, তোর কথা শুনে যদি সত্যিকারের কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার হয়? জানিস তো আমি হাতুড়ে কিন্তু ডাকাত নই—যেটুকু জানি সেটুকু খাটাই, খটকা লা লে চেনা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করি, তাতেও না কুলোলে সোজাসুজি বলে দিই, অন্য ডাক্তার ডাকো। তোর বেলা দরকার হলে আমি কিন্তু কোন বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করব। তবে তোর নামটা ডাক্তারের কাছে বলব না। ওষুধ এনে খাওয়াতে পারি, আমিই খাওয়াবো।

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বলে, পারবে না। এমনিতেই সারাদিন খালি বমি করছি। ওষুধ খাবার নাম করলেই পেটটা উগরে দেব।.

: সারাদিন বমি করছিস?

: সারাদিন। জল পর্যন্ত বমি হয়ে যাচ্ছে।

: সব তোর মিছে কথা, বানানো কথা।

: মিছে কথা, বানানো কথা? আমার মত দশা তোমার হলে টের পেতে ডাক্তারকাকু।

শ্যামাদাস হেসে বলে, তোর মত দশা আমার কোন দিন হবে না। ঘুম ভেঙ্গে আগে আমি মাকে ডাকি। রোজ বার বার বমি করিস, বাথরুমে গিয়ে লুকিয়ে করিস। আজ তোকে বাগে পেয়েছি, ছাড়ব না। আধ ঘণ্টায় তোর বমি সারিয়ে দেব। পেট ভরিয়ে খাবার খাওয়াবো—একটা ওষুধও খাওয়াবো।

বমি করে ডাক্তারখানা ভাসিয়ে দিতে পারলে মানব যে তুই সত্যি কথা বলেছিস। তখন দেখা যাবে কি করা যায়।

ইন্দ্রাণী চোখ বোজে।

সে যে কয়েকবার শিউরে ওঠে সেটা স্পষ্টই ধরা যায়, কারণ, শিহরণটা দেহেও প্রকট হয়।

ক্ষীণস্বরে বলে, ওষুধ খাওয়াবে? পেট ভরে খাবার খাওয়াবে? বমি হবেই ডাক্তারকাকু। সকাল থেকে পাঁচবার বমি করেছি। কেন মিছে কষ্ট বাড়াবে?

শ্যামাদাস তবু জোর গলায় বলে, বললাম তো মন্ত্রপড়া ওষুধ দেব, বমিও হবে না, কষ্টও হবে না। যদি তোর খারাপ লাগে, যদি তুই গলায় আঙুল না দিয়ে বমি করতে পারিস—হাতুড়ে-গিরি ছেড়ে দিয়ে বনে চলে যাব। এ ডাক্তারখানায় আর আসব না, এ জীবনে আর কোনদিন কোন রোগীর চিকিৎসা করব না।

: এমন জোরের সঙ্গে বলা?

: মিছে কথা জীবনে বলি নি। নিজের কথার এদিক ওদিক জীবনে করি নি। জেনে বুঝেই বলছি তোর অসুখ আমি সারিয়ে দেব। না পারলে এ জীবনে আর একটা রোগীও চিকিৎসা করব না।

শ্যামাদাস ওষুধের শিশি খুলে একটা সাদা বড়ি বার করে ব্লেড দিয়ে দু'টুকরো করে আধখানা বড়ি ইন্দ্রাণীর হাতে দেয়, কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেয়।

ইন্দ্রাণী অসহায় ভাবে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি সত্যি বিশ্রী রকম কষ্ট হবে না তো ডাক্তারকাকু?

শ্যামাদাস তার কাতরতা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, তোর কষ্ট সারাবার ওষুধ দিচ্ছি, তাতে তোর কষ্ট হবে? বার বার বলছি তো, কোন কষ্ট টেরও পাবি না।

ইন্দ্রাণী আধখানা বড়ি গিলে ফেলে।

: দশ মিনিট পরে খাবার খাবি। চুপ করে বসে থাক। পারিস তো বমি কর।

তারপর শ্যামাদাস নিজে গিয়ে মোড়ের বড় দোকানে ইন্দ্রাণীর জন্য বিশেষ খাবারের অর্ডার দিয়ে আসে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ইন্দ্রাণীর সামনে হাজির হয় খাবারের প্লেট। দু'টি সন্দেশ, দুটি রসগোল্লা, দুটি ছানার জিলাপি এবং এক কাপ দুধ।

শ্যামাদাস বলে, খা। খেয়ে যদি বমি হয়—সেটা আমার দায়। তুই নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে পেট ভরে খা।

সকাল থেকে পাঁচবার বমি করে চড়া খিদেই বুঝি পেয়েছিল ইন্দ্রাণীর। সে সব কিছু খেয়ে প্লেট সাফ করে দেয়।

তারপর শ্যামাদাস ধমক দিয়ে একরকম জোর করেই তাকে বাকি আধখানা বড়ি খাইয়ে দেয়।

পুরানো একজন বুড়ো রোগী এলে তাকে নিয়ে শ্যামাদাস মিনিট পনের ব্যস্ত হয়ে থাকে।

সে বিদায় হয়ে যাবার পর ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করে, কি রে ইঁদুরাণি বমি করতে পারলি না?

দেখলেই টের পাওয়া যায় ইন্দ্রাণীর মুখচোখের চেহারাই যেন আধ ঘণ্টায় অন্য রকম হয়ে গেছে।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তুমি সত্যি মন্ত্র জানো ডাক্তারকাকু! ওষুধ খেলাম, জল খেলাম, এতগুলো খাবার খেলাম—একটুও খারাপ লাগছে না! বমির ভাবও আসছে না।

তার উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত ভাব শ্যামাদাসকে একটু যেন বিচলিত করে। মেয়েটার এতদিনের গোপন করা বমি রোগ হঠাৎ সারিয়ে দিয়েও সে যেন উৎফুল্ল হতে পারে না।

ইন্দ্রাণী নিজের মনে কথা বলে যায়—ওষুধ না খেয়ে বান্ধবীদের পরামর্শে এবং নিজের বুদ্ধিতে অসুখটা সারিয়ে ফেলার চেষ্টা করার ইতিহাস।

শ্যামাদাস চুপচাপ শোনে।

ইতিমধ্যে প্রাণেশ্বর এসে হাজির হয়।

ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরেও তাকায় না।

শ্যামাদাসকে শুনিয়ে বলে, একটু দেরী হয়ে গেল। তোমার এই গলিটার মোড়ে কী বিশ্রী একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট যে হল ডাক্তারকাকু! চেপ্টে গিয়ে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়েছে একজনের। নিজের চোখে দেখে আমার পেট গুলিয়ে ফিট হবার মত অবস্থা হয়েছিল।

ইন্দ্রাণী মস্ত একটা হাই তুলে ধীর শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করে, কিসের অ্যাক্‌সিডেণ্ট প্রাণেশদা?

তার দিকে তাকিয়ে প্রাণেশ্বর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থাকে।

কেবল তেজস্বিনী প্রাণময়ীই হয়ে ওঠে নি—মুখের চামড়ার রঙ পর্যন্ত যেন তার বদলে গিয়েছে, একটা অস্বাভাবিক রঙীন আভা দেখা দিয়েছে। অথচ এমনভাবে হাই তুলছে যেন কয়েক রাত্রি ঘুমায় নি।

পাড়ার বসাকদের বাড়ির বড় গিন্নী নিয়মিত মদ খেত। তাকে দোষ দেওয়া যায় না—অভ্যাসটা জন্মিয়ে দিয়েছিল বসাকবাড়িরই বড়কর্তা জন্মেজয়বাবু।

বাইরে গিয়ে স্ফূর্তি করার ক্ষমতা হারাবার পর।

বড় গিন্নী ছিল খুব ফর্সা।

আজকাল প্রায়ই সে প্রাণেশ্বরকে ডেকে পাঠিয়ে দাবী জানাত, ডাক্তারি পড়ছিস, ঘুমের ওষুধ দে। জানি রে বাবা জানি, একেবারে ঘুমিয়ে পড়ার ওষুধ তুই দিবি নে। তোকে কয়েক হাজার টাকা দেব, গয়নাগাঁটিগুলো সব দেব। তবু তুই এমন ওষুধ দিবি নে—খেয়ে শুলে এক ঘুমে যাতে জীবন কাবার হয়ে যায়, আর জাগতে হয় না।

প্রাণেশ্বর বলত, ডাক্তার হোক, ডাক্তারি শেখার ছেলে হোক, ওসব ওষুধ কি তারা বিক্রী করে দিদি-মা? এমনি দোকান তো আছে, কিনে এনে খেলেই হয়।

: খাই নি? খেয়ে লাভ নেই, কেউ আমাকে মরতে দেবে না। শুধু যন্ত্রণাই সার। পেটে নল চালিয়ে পাম্প করাবে, গা ফুঁড়ে ওষুধ দেবে, গা এলিয়ে এলে কেঁদে-ককিয়ে মরলেও শুতে দেবে না।

অবিকল সেই বুড়ী দিদিমার মুখের আভা যেন ফুটেছে ইন্দ্রাণীর মুখে।

ফর্সা মুখে অবিকল সেই রকম লালিম অস্বাভাবিকতা।

অ্যাক্সিডেণ্ট প্রতিদিনই ঘটছে শহরের বুকে। প্রাণে তার কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছে সে সব সে আর প্রকাশ করে না। দু'টো মোটরবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের খবরটা মোটামুটি জানিয়েই প্রাণেশ্বর এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে সোজা নিজের ঘুপচিটার মধ্যে গিয়ে ওষুধ তৈরি শুরু করে দেয়।

শ্যামাদাসের স্লিপ মোটে একটা, সেই কুইনিন মিক্শ্চার।

কিন্তু শ্যামাদাসের নিজের কায়দায় লেখা ব্যবস্থাপত্রই শুধু নয়। অন্য ডাক্তারের কয়েকটা প্রেসক্রিপসন আজ একদিনে তাদের এই ছোট নতুন ডিস্‌পেন্‌সারীতে এসে জমেছে।

ভাগ্যের কথা।

সত্যই যেন ম্যাজিক ঘটিয়েছে শ্যামাদাস।

এতটুকু ডিস্‌পেন্‌সারীতে সে রোগী আর রোগিণীর সমাবেশ ঘটিয়েছে অদ্ভুতরকম।

ফি দেয় খুব কম লোকেই।

কিন্তু ওষুধ বিক্রী হয় হিসেবেরও অনেক বেশী।

নিজের বাড়িতে পর্যন্ত বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া কঠোরভাবে বন্ধ করে দিয়েছে, নগদ পয়সা না দিয়ে কারো দুটো কাসি ঠেকাবার বড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া বারণ।

নগদ দামেই সবাই ওষুধপত্র নিয়ে যায়।

অল্প দামের বড়ি থেকে অনেক দামী পেটেণ্ট ওষুধ, এমন কি শ্যামাদাসের লেখা মিকশ্চার পর্যন্ত।

শ্যামাদাসের লেখা প্রেসক্রিপসন ইত্যাদির দামও তার দোকানে খুব বেশী পড়ে।

তবু তার দোকান থেকে তার ব্যবস্থা করা ওষুধপত্র লোকে নগদ দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায়।

প্রাণেশ্বর কিছু বলে না।

কিন্তু শ্যামাদাস টের পায় প্রাণেশ্বরের প্রাণে সমালোচনা জেগেছে।

সে প্রাণেশ্বরকে নিজে থেকেই একদিন ডেকে কাছে বসিয়ে সরল ভাবে বলে, তুই যা ভাবছিস তা মিছে নয় প্রাণেশ। ওষুধের দাম আমি একটু বেশী করি। শুধু কুইনিন মিকশ্চার দিলে যেখানে কাজ হবে, আমি দু'তিনটে বাড়তি ওষুধ মিশিয়ে দিই। নির্দোষ সব ওষুধ, কারো কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু মোটমাট জ্বরের মিকশ্চারের দামটা বেশী হয়ে যায়। কী করব বল? সাতদিনে চারবার দেখতে গেলাম, একটা পয়সা ফি দিল না। ওষুধের দামে আট দশ আনা পয়সা পাব।

প্রাণেশ্বর জোর গলায় বলে, এ নীতি ভাল নয়। মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার কাছে আসে—আপনি তাদের ঠকাচ্ছেন।

শ্যামাদাস ভয়ঙ্কর রেগে যায়।

: ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে যারা একঘণ্টা দু'ঘণ্টা রোগী দেখিয়ে এক পয়সা ফি দেয় না—তারা আমায় ঠকায় না?

: ফি না দিলে যান কেন?

: না গিয়ে যে পারি না।

: তবে আবার আপশোষ করেন কেন?

: তাই তো হয়েছে মুশকিল।

শ্যামাদাস নিজে তামাক সেজে টানতে শুরু করে। বলে, এত নীতিনিয়ম পালন করলাম, তবু কেন নত হলাম?

প্রাণেশ্বর বলে, পালন করেছেন নিজের নিয়মনীতি। সেটা নিয়মনীতি কিনা তাই বা কে জানে?

শ্যামাদাস এবার আর তার কথা শুনে রাগ করে না, হাসে। বলে, তুই বড় খাপছাড়া অদ্ভুত কথা বলিস প্রাণেশ। নিজের নিয়মনীতিই মানুষ পালন করে। নিয়মনীতি কি ধার করতে যাব অন্যের কাছে?

প্রাণেশ্বর এতটুকু দমে না গিয়ে বলে, দরকার হলে তা করতে হয়—সবাই করছে। নিজে ভুল করছি কিনা সেটা অন্যের কাছ থেকেই জানতে হবে—তাতে দোষ নেই।

প্রাণেশ্বর কেবল শ্যামাদাসের সঙ্গেই কথা বলে, ইন্দ্রাণী যে উপস্থিত আছে সেটা যেন তার খেয়ালও হয় না।

ইচ্ছা করেই সে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকায় না।

এরকম নিদারুণ অবহেলা পর্যন্ত তুচ্ছ করে ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করে, রাত্রে খেতে যাবে তো প্রাণেশদা'? মা-কে রান্নাবান্না সব ঠিক করে রাখতে বলব তো?

ওষুধ বানাতে বানাতে প্রাণেশ্বর বলে, যা খুশি বলিস।

: যা খুশি বলব মানে? মা তোমার জন্য বিশেষ করে এটা ওটা রাঁধবে, কখন তুমি দয়া করে গিয়ে খাবে বলে হাঁ করে বসে থাকবে—তাই জিগ্গেস করলাম। খেতে যাবে কি যাবে না জানিয়ে দিলেই ফুরিয়ে যায়।

: তোর খুশিমত ফুরিয়ে যাবে? রাত্রে খাব কি খাব না সেটা আমাকে এখন জানিয়ে দিতে হবে তোর গরজে?

: আমার গরজ কিসের? মা'র কথা বলছিলাম।

: ওটাকেই গরজ বলে। মণি-মার কথা তোর বলার দরকার কি? কিছু বলার থাকলে মণি-মাই আমাকে বলতে পারবে—মণি-মার মুখ আছে, মণি-মা বোবা নয়।

পরমাশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয় যে প্রাণেশ্বরের এরকম গা-জ্বালানো কথা শুনেও ইন্দ্রাণী ফুঁসে ওঠে না।

সে শুধু একটু হাসে।

বলে, তোমার মণি-মা আমার নিজের মা, সেটাও কি ভুলে গেছ প্রাণেশদা?

শ্যামাদাসের একটা সাদা বড়ির কি অদ্ভুত শক্তি! এক প্লেট খাবার শুধু বিনা কষ্টে সহ্য করায় নি, অনিবার্য বমিটাই শুধু ঠেকায় নি, মন-মেজাজ পর্যন্ত বদলে দিয়েছে! কে ভাবতে পারত যে প্রাণেশ্বরের গা-ছাড়া ভাব আর ওরকম বিশ্রী ধমক ইন্দ্রাণী এমন ঠাণ্ডাভাবে হাসিমুখে বরদাস্ত করবে!

ইন্দ্রাণীর এই অদ্ভুত পরিবর্তনটা খেয়াল করে প্রাণেশ্বর নরম হয়ে গিয়ে বলে, বলিস্ যে রাত্রে যাব, দশটা নাগাদ। বেশী কিছু করতে বারণ করিস মণি-মাকে। পেটের গোলমাল চলছে।

তারপর ইন্দ্রাণী একটু চুপ করে থেকে বলে, একটা কথা বলব প্রাণেশদা? আমি সরলভাবে বলছি। মানেটা বুঝতে পারবে? কথাটা রাখতে চেষ্টা করবে? এবার তুই-তোকারি বন্ধ কর।

শ্যামাদাসও সায় দিয়ে বলে, হ্যাঁ, তাই করা উচিত। ইঁদুরাণী এখন বড় হয়েছে, আমরা বাপের বয়সী মানুষ, আমরা বললে খারাপ শোনায় না—তোমার মুখে তুই-তুই কথা বিশ্রী শোনায়।

প্রাণেশ্বর খুব শান্ত খুব গম্ভীর ভাবে ইন্দ্রাণীকে বলে, সেটা আমিও খেয়াল করেছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানো? ছেলেবেলা থেকে তুই বলা অভ্যাস হয়ে গেছে—সর্বদা কি খেয়াল থাকবে? খানিকক্ষণ নয় খেয়াল করে তুমি বললাম, তারপর মনে থাকবে না।

শ্যামাদাস বলে, অভ্যাস ছাড়া যায়—ছাড়ানো যায়। আমি একটা প্রস্তাব করছি—মন দিয়ে শোন। তুই বলার অভ্যাস ছাড়লে ইঁদুরাণীও তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। যখনি তুমি তুই-তুই করে কথা বলবে, ইঁদুরাণী ঝেঁঝে উঠে ধমকে দেবে। তুমি কিন্তু রাগতে পারবে না—সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্বীকার করে মাপ চাইবে।

ইন্দ্রাণী বলে, ওরে বাবা! আমারও কি সব সময় খেয়াল থাকবে—প্রাণেশদা তুই-তোকারি চালাচ্ছে! আমারও তো শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে।

শ্যামাদাস বলে, দু'জনেই যতটা পার খেয়াল রাখবে। দু'চার দিনে না হয়, দু'চার মাসে অভ্যাসটা কেটে যাবে।

প্রাণেশ্বর বলে, থাক্—সামান্য ব্যাপারে অত ঝন্ঝাট করে কাজ নেই। আমার আরও অনেক কাজ আছে। এসব ছ্যাবলামির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে আমার চলবে না। আমিই আজ থেকে অভ্যাসটা বাতিল করলাম। আজ থেকে, এখন থেকে আর কখনো তোমাকে তুই বলব না।

শ্যামাদাস উল্লসিত হয়ে বলে, এই তো চাই। পারবি তো প্রাণেশ?

: নিশ্চয় পারব। ঐটুকু যদি না পারি তাহলে আমার আর বেঁচে থেকে দরকার নেই।

ইন্দ্রাণীকে খুশী মনে হয় না।

সে শ্যামাদাসকে বলে, ওর কথার মানে বুঝলেন? আমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিল। কথাই বলবে না আর—সব সমস্যা মিটে যাবে। আপত্তিটা না তুললেই পারতাম।

হুঁকোতে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে শ্যামাদাস জিজ্ঞাসা করে, তাই তোমার মতলব নাকি প্রাণেশ?

প্রাণেশ্বর বলে, ও রকম সস্তা মতলবের ধার আমি ধারি না।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রাণেশ্বর ওষুধ তৈরি করে। এলোমেলো যেমন তেমন ভাবে নয়—খাতায় সব লিখে রাখে। কোন্‌টা শ্যামাদাসের, কোন্‌টা বাইরের অন্য ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন—সব।

অন্য ড়াক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন নিয়ে কেউ এলে তাকে সে জিজ্ঞাসা করে, আমার দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে যাবেন, আপনার ডাক্তার রাগ করবেন না তো—উনি যে দোকানে বসেন সেখান থেকে নিলেন না বলে?

: ইচ্ছা হলে রাগ করবেন। ডাক্তারের রাগ ধুয়ে জল খেলে তো ব্যারাম সারে না, ঠিকমত ওষুধটাও দরকার।

: ও ডাক্তারের কাছে যান কেন তবে?

: ডাক্তার ভাল—বিশ বাইশ বছরের বাঁধা ডাক্তার। দোকানের মালিক ওষুধের বদলিতে সিরাপ-মেশানো জল দিয়ে টাকা করার ফিকিরে আছে। সাত কাঠা জমি কিনে মস্ত দোতলা বাড়ি করছিল—টাকায় বুঝি কুলোল না। এখন ভেজাল ওষুধ বেচে টাকা করছে, বাড়ি তুলছে।

তারপর টের পাওয়া যায় চপলের টাকা টাকা করে এরকম মরিয়া হয়ে ওঠার আসল কারণ।

প্রায় সকলের কাছেই গোপন রেখেছিল।

কিন্তু জানাজানি হয়ে যায়।

টাকা নিয়ে সে ফুর্তি করে উড়িয়ে দেয় না। হৈ চৈ করা বা নেশা করার খামখেয়ালীর জন্য সে মণিমালার বিশ্বাস ভঙ্গ করে ক্যাশ বাক্সের টাকা চুরি করে নি।

তার কঠিন মারাত্মক রোগ হয়েছে।

কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজেই এভাবে চিকিৎসা নিজেই চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ইন্দ্রাণী কাতর স্বরে বলে, মামা, এমন রোগ কি করে বাধালে তুমি? আমাদের কাছে লুকিয়েই বা রাখলে কেন?

চপল একটা নিশ্বাস ফেলে।

: এ বড় বিশ্রী ব্যারাম জানি। জানাজানি হলে মানুষ এড়িয়ে যায়—আত্মীয়স্বজন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়!

সে জ্বালা ভরা হাসি হাসে।

: ভেবেছিলাম নিজে চেষ্টা করে যদি সেরে উঠতে পারি। একটা আশ্রয়ে আছি, খাওয়া-দাওয়া ভালমত জুটছে—শুধু চিকিৎসাটা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু কি খরচ রে এ রোগের চিকিৎসায়!

ইন্দ্রাণী বলে, আমাদের জানালেই পারতে, আমরা যে ভাবে পারি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতাম।

: কে জানে সেটা ভুল হয়ে গেছে কি না। ভয় হল যে এত খরচ কে করবে; মাঝখান থেকে আশ্রয়টুকু হারাব।

মণিমালা বলে, অসুখ-বিসুখ হলে মানুষের বুদ্ধি বিগড়ে যায়। তবে সত্যি কথাই, এ রোগটা বিষম ছোঁয়াচে।

চপল বলে, সেটা আমি খেয়াল রেখেছি দিদি। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে এসেছি প্রাণপণে। নিজের এঁটো বাসন নিজে ধুয়ে মেজে সাফ করি—তোমরা ভেবেছ এটা আমার পাগলামি। আমার অনেক চালচলন তোমাদের পাগলামি মনে হয়েছে—তাও আমি জানি।

আশ্রয় হারাবার আশঙ্কা যে তার অমূলক ছিল না, দু'এক দিনের মধ্যেই সেটা টের পাওয়া যায়।

ব্যাপার জেনেই সমর ওঠে আঁতকে।

সোজাসুজি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করে, না, না, আবোল-তাবোল কথা বোলো না কেউ—ওকে বাড়িতে রাখা চলে না।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করে, তাড়িয়ে দেবে?

সমর বলে, তাছাড়া উপায় কি? এতদিন কেটে গেছে, আর দু'একটা দিন চোখকান বুজে কাটিয়ে দেব। নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিক।

: কি ব্যবস্থা করবে?

: হাসপাতালে যাক, স্যানাটোরিয়ামে যাক—যেখানে খুশি যাক। একটা ব্যবস্থা করার জন্য আমিও উঠে পড়ে লাগব। কিন্তু বাড়িতে ওকে আমি রাখতে পারব না আর। ওরে বাবা, কী সর্বনাশের ব্যাপার।

কথা সে জোরে জোরেই বলে। চপল প্রতিটি কথাই শুনতে পায়।

রাত্রে সকলের সঙ্গেই তাকে খেতে ডাকা হয় বটে, কিন্তু দেখা যায় তাকে বসতে দেওয়া হয়েছে পৃথক ভাবে, অনেকটা তফাতে সরিয়ে।

আরম্ভেই কথা তুলে সমর সকলের খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় না। খাওয়া শেষ হয়ে এলে সে খুব দুঃখিতভাবে বলে, চপল, তোমায় তো আমি আর রাখতে

পারছি না। তুমি বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা—কিন্তু কি করব বল। ছা-পোষা মানুষ—আমার কোন উপায় নেই।

চপল বলে, জানি। কাল সকালেই আমি চলে যাব।

চাটনি ফেলে রেখে ইন্দ্রাণী উঠে যায়। তার এত সাধের আলু-তেঁতুলের ঝাল দেওয়া চাটনি।

দুধের বাটিতে চুমুক দিয়ে সমর আবার বলে, অনেক আগেই তোমার চলে যাওয়া উচিত ছিল।

মণিমালা একটু রাগ করে বলে, কাল সকালেই চলে যাবে বলেছে, তবু কথা বাড়াচ্ছ কেন?

: এতবড় অন্যায় করেছে, আমি কিছু বলব না? সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম।

: জগতে অনেকে অনেক রকম অন্যায় করে। ওর অন্যায়টা এমন কিছু মারাত্মক নয়। আমাদের জানায় নি, এইটুকু শুধু দোষ হয়েছে। তাও ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই জানায় নি, নিজেই সবরকম ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলেছে।

সমর অবশ্য চপলকে সকালবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বারণ করে দেয়। বলে যে এতদিন যখন কেটে গেল, একবেলা, দু'বেলায় কিছু আসবে যাবে না।

: চেষ্টা করে দেখি, একটা ব্যবস্থা যদি করা যায়। অনুকূল এসব রোগের ব্যাপারে স্পেশালিষ্ট—ওর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে আসি।

চপল এমন বিশ্রীভাবে হাসে যে সমরের গায়ে জ্বালা ধরে যায়। কিন্তু ছেলেটার জীর্ণ-শীর্ণ শুকনো মুখের দিকে চেয়ে সে চুপ করে থাকে।

চপল বলে, অনুকূল বাবুর কাছে গিয়েছিলাম। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এখন কিছু করা সম্ভব নয়। যেখানে যত জায়গা ছিল সব ভর্তি হয়ে গেছে।

: ওরকম ওরা বলেই থাকে। আমাকে অত সস্তায় এড়িয়ে যেতে পারবে না। গিয়ে চেপে ধরলে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবে।

: কেন?

: কারণ আছে। আমি টাকার ব্যবস্থা করে না দিলে অনুকূলের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে ডাক্তার হতে হত না!

চপল আবার বিশ্রীভাবে হাসে।

: কৃতজ্ঞতার আশা? ও আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

: না, না, অনুকূল আমার সঙ্গে ওরকম ছোটলোকমি করবে না।

: তা হয় তো না করতে পারে। মানুষকে খাতির করে চলাও তো ওর একটা কায়দা। তবে আমার বিশ্বাস হয় না তোমাকে খাতির করবে।

: দেখা যাক। একবার ঘুরে আসি। অনুকূল ব্যবস্থা না করলে অন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সে আমি ঠিক করে দেব।

: ঠিক তো সবাই করে দেবে বলে—শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠিক হয় না।

: দেখা যাক্।

দুপুরে সমর ফিরে আসে।

চপলের একটা ব্যবস্থা করার জন্য সে আপিস থেকে ছুটি নিয়েছিল।

ম্লান মুখে বলে, নাঃ, কিছুই করতে পারলাম না। অনুকূল ভদ্রতা করে এক কাপ চা খাইয়ে বিদায় করে দিল। বলল যে আর একটা রোগীকেও নেবার সাধ্য ওর নেই।

চপল বলে, আমি তো আগেই বলেছিলাম।

সমর রেগে গিয়ে বলে, তাই বলে চেষ্টা করতে হবে না। অনুকূল নাই বা করল, আমি অন্যভাবে ব্যবস্থা করব।

চপল খানিকক্ষণ যেন অভিভূত হয়ে থাকে।

তারপর বলে, আমি মরণ পণ করলাম। এ ভালবাসার মর্যাদা নিশ্চয় রাখব।

৬

নাচের স্কুলে ইন্দ্রাণী ও মৃদুলার সংঘর্ষ বাধে।

নাচের শিক্ষক রামেন্দ্র একটা পৌরাণিক কাহিনীর সিনেমা তোলায় অংশীদারিতে নেমেছে।

ইন্দ্রাণীর রূপের সত্যই যেন তুলনা নেই। পুরাণে স্বয়ং ব্রহ্মার মানস-কন্যা তিলোত্তমা সৃষ্টি করার গল্প আছে। ইন্দ্রাণী বেশভূষা না করেও তার কথা মনে পড়িয়ে দেয়, যদিও অবশ্য তাকে চোখে দেখার ভাগ্য হয় নি, মানস-লোকে কল্পনা করে নিতে হয়।

সবটা ফাঁকা কল্পনা নয়—এ-কালের মানুষের ওদিক দিয়ে সুবিধা আছে। রক্তমাংসের অনেক তারকার ছায়ারূপ তারা দর্শন করে, সুযোগ পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিড় করে পথের ধারে অপেক্ষা করে—নতুবা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে টিকিট কিনে আসল মানুষটাকে একনজর দেখবার সুযোগও অনেকে ছাড়ে না।

অধুনা অস্তমিতা এবং নবোদিতা তারকাদের সংখ্যা কম নয়। কল্পনায় তিল তিল করে চয়ন করে মানস এক তিলোত্তমা সৃষ্টি করা কত যে সহজ হয়ে গেছে সিনেমার কল্যাণে!

অনেকে ওই কথা বলে। ইন্দ্রাণীর রূপে নাকি কয়েকজন রূপসী চিত্র-তারকার রূপের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে।

ইন্দ্রাণী নিজে মানত এবং আত্মীয়বন্ধু অনেকেই বিশ্বাস করত যে চিত্র-গগনে তারকারূপে উদিত হওয়া তার পক্ষে খেয়াল-খুশির ব্যাপার—সে রাজী হয়ে এগিয়ে গেলেই হল।

তাকে নিয়ে ছবি তোলার সুযোগ পেলে যে-কোন প্রযোজক নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে।

শুধু কলকাতায় নয়, বোম্বাইয়েও।

কবে সে হঠাৎ বোম্বে রওনা হয়ে গেছে খবর পাওয়া যাবে—সে কথাও আত্মীয়বন্ধুরা ভাবে।

চপলের অসুখের খবর জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে লুকিয়ে মণিমালাকে কাঁদতে দেখে এবং সর্বদা বাড়িতে একটা ঘন বিষাদের আবহাওয়ায় নিজেরও দম আটকে আসতে থাকায় ইন্দ্রাণী একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে।

মণিমালা ও চপলের সামনে মুখোমুখি কড়া সুরে বলে, ভেবেছিলাম আরও দু'তিন বছর দেরী করব কিন্তু মামার রোগটার ঠিকমত চিকিৎসা দরকার। নিজে খেটে পয়সা কামিয়ে কেউ এ রোগের চিকিৎসা চালাতে পারে? আমি সিনেমায় ঢুকব। যদ্দিন দরকার মামাকে স্যানিটোরিয়ামে রেখে আসল চিকিৎসা চালিয়ে যাব।

ইন্দ্রাণী নিজে থেকে বলে, আমায় সীতার পার্টে মানাবে না?

: মানাবে না কেন? ভালরকম মানবে। কিন্তু সীতা অনেক আগেই ঠিক হয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণীর মুখ একটু লম্বা হয়ে যায়।

রামেন্দ্র বার বার মৃদুলার দিকে তাকায়।

জিজ্ঞাসা করে, আপনিও কি এখানে নাচ শেখেন?

মৃদুলা বলে, শিখি। আমাকে নাচিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির ফন্দি আঁটছেন নাকি?

রামেন্দ্র হেসে বলে, আপনি নাচলে কেউ হাসবে না। আপনাকে নাচালে বরং লোকে আমাদের গালাগালি করবে। আপনি রাজী হলে একটা বড় পার্টে আপনাকে নামাতে পারি। বড় ষ্টারদের মত না হলেও ভাল টাকা পাবেন।

ইন্দ্রাণীর চোখ আরও বড় বড় হয়ে যায়।

তাকে প্রত্যাখ্যান করে মৃদুলাকে ডেকে সিনেমায় নিতে চায়!

মৃদুলা বলে, সিনেমায় যাবার সখ নেই।

রামেন্দ্র বলে, এলে দোষ কি? অবসর সময়ে গিয়ে একটু খাটবেন, মোটা পয়সা রোজগার হবে। এতে আপত্তি করার কি আছে? আপনাকে কাজে লাগানো যাবে বলেই অনুরোধ করছি, নইলে—

মৃদুলা হেসে বলে, সেটা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি, আপনাদের একজন মুটকি মেয়ে দরকার।

: না, মুটকি নয়—মুটকি অনেক পাওয়া যায়। আপনি মোটা কিন্তু সেরকম মোটা নন। সত্যি কথা বললে রাগ করবেন না তো? আপনার শক্ত পালোয়ানী চেহারাটা আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে।

মৃদুলা জিজ্ঞাসা করে, কি ভূমিকায় তাকে দরকার? রামেন্দ্র বলে, তাকে নেওয়া হবে স্থর্পণখা রাক্ষসীর ভূমিকায়।

স্থর্পণখাকে চিরকাল কুৎসিত বিকটাকার করা হয়ে থাকে—তারা তা করবে না। হলই বা রাক্ষসী—সে রাবণ রাজার বোন। রাম ও লক্ষ্মণের প্রেম যে ভিক্ষা করবে তার বিশেষ ধরনের রূপ-যৌবন থাকবে না—যার বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে?

মৃদুলাকে তারা ওইভাবে রূপায়িত করবে।

অবশ্য ক্যামেরার টেষ্টে যদি সে উৎরে যায়—তবেই।

মৃদুলাকে কত টাকা দিতে চেয়েছে তার অঙ্ক শুনে ইন্দ্রাণীর মুখ আরও লম্বা হয়ে যায়।

: রাক্ষসীর পার্টে নামবে?

: নেমে যাই। দেখা যাক কি হয়। মোটা টাকাটা তো আগাম দেবে। এবারের শীতে প্রায় সকলের গরম জামা চাদর চাই—ও বছরটা কোন রকমে কেটেছে। লেপও করতে হবে। বাবা এর মধ্যেই মাথার চুল হাতড়াতে শুরু করেছে, কদিন বাদে ছিঁড়তে শুরু করবে। দেখি রাক্ষসীর পার্ট করে যদি সামাল দিতে পারি।

এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার আর কি হতে পারে?

এমন রূপবতী ইন্দ্রাণীকে প্রত্যাখ্যান করে মৃদুলাকে মহা সমাদরে সিনেমায় ডেকে নিয়ে গেল !

মণিমালার মনটাও বিগড়ে গেছে।

অগত্যা প্রাণেশ্বরকে ভোর বেলা যেতে হয়। মণিমালার তৈরি করা গুরুপাক লুচি তরকারী খেতে হয়।

ইন্দ্রাণী সকলের সঙ্গেই মানিয়ে চলার চেষ্টা করে।

কিন্তু সাধ্যে কুলোয় না।

অনেক সহ্য করে।

তারপর সহ্য করার জ্বালাতেই মেজাজ বিগড়ে যায়।

তখন আর কারো সঙ্গেই খাতির বজায় রাখা সম্ভব হয় না তার পক্ষে।

কথায় কথায় রেগে যায়।

গলা ফাটিয়ে চেঁচায়।

মাঝে মাঝে কেঁদেও ফেলে।

মেজাজ ঠিক আছে জেনে সময় বুঝে প্রাণেশ্বর তাকে বলে, পরের ব্যাপার নিয়ে এত বেশী মাথা ঘামাও কেন, বাড়াবাড়ি কর কেন ?

ইন্দ্রাণী বলে, শুধু নিজের চিন্তা নিয়ে মেতে থাকব ?

: অন্যের ভালো করতে পারলে অন্যের কথা ভাবা ভালো। তা তো তুমি পারছ না। শুধু নিজের মেজাজ গরম করছ, শরীর খারাপ করছ।

: এত বেশী উপদেশ ঝেড়ো না।

: উপদেশ নয়—পরামর্শ।

চপলের কাছে ব্যাপার শুনে মণিমালা খুব রেগে যায়।

প্রাণেশ্বর এলে রাগতভাবে বলে, ইন্দ্রাণীকে তুই এত প্রশ্রয় দিস কেন রে ?

প্রাণেশ্বর হাসে।

: প্রশ্রয়? ইন্দ্রাণীকে? ও আমায় প্রশ্রয় দেয় কিনা ওকে আগে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও।

মণিমালা আরও রেগে যায়।

: তুই ওর ছ্যাবলামি মানিস কেন?

: আমি মানব কি না-মানব কেয়ার করে নাকি? বলতে গেলে হাসে। জোর করে বলতে গেলে রেগে যায়—গাল দেয়। কি বলে জানো? গুণ্ডামি শুরু করলে মাথা ফাটিয়ে দেব কিন্তু প্রাণেশদা—নিজেরটা বুঝে নিজে চলো, আমার জন্যে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না।

: মেয়ের গুণপনা দিন দিন বাড়ছে। আমরা তো এরকম ছিলাম না।

: তোমাদের দিনকাল কি আছে?

: এর মধ্যে সেকেলে হয়ে গেলাম? এখনো চল্লিশ পেরোয় নি।

প্রাণেশ্বর হাসে।

: বয়সের হিসাবে ওসব ব্যাপারের মানে বোঝা যায় না মণি-মা। দু'চার দিনে জগৎসংসার উল্টে-পাল্টে যায়।

: উল্টে-পাল্টে যায়? রোজ ঠিক নিয়মে সূর্য উঠছে, চাঁদ উঠছে, দিবারাত্রি হচ্ছে—

: ওসব তো ঠিক আছেই। আমি মানুষের জীবন-যাত্রার নিয়মের কথা বলছিলাম। চারদিকে ওলোট-পালোট হয়ে গেছে—ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে।

মণিমালা ধীরভাবে বলে, ওটা তো খবরের কাগজের খবর।

: খবরের কাগজ ছাড়া খবর পাওয়া যায় নাকি?

: আসল খবর নিজের মন থেকে জানতে হয়—খবরের কাগজ পড়ে ব্যস্ত হতে নেই। প্রাণেশ্বর হেসে ফেলে।

: মনের খবরটা আলাদা নয় মণি-মা। সব একসঙ্গে জড়িয়ে আছে।

কে ভাবতে পেরেছিল যে খবরের কাগজ এমন বড় বড় অক্ষরে ফলাও করে প্রাণেশ্বরের নাম ছাপানো হবে তিন রাত্রি না কাটতেই।

হাঙ্গামা করেছে।

পুলিশের গুলি লেগেছে।

হাসপাতালে গেছে।

খবরের কাগজে খবর ছাপার সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিল বুঝতে পারা যায়।

তারপর কি হয়েছে কে জানে!

ইন্দ্রাণী কেঁদে ফেলে কিনা দেখবার জন্য মণিমালা চুপ করে থাকে।

খবরের কাগজে প্রাণেশ্বরের খবর পড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে মাথায় তেল ঘষে সাবান নিয়ে ইন্দ্রাণী স্নান করতে গেলে মণিমালা সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

চা আর আলুর ছেঁচকি দিয়ে রাত্রে তৈরী বাসি রুটি খেতে খেতে ইন্দ্রাণী বলে, আমি এখুনি হাসপাতালে প্রাণেশকে দেখতে যাচ্ছি। তুমি যাবে?

: একটু আগে বলতে পারলি না? আমি বুঝতেই পারলাম না এত ভোরে তুই কেন চান-টান সব সেরে নিচ্ছিস।

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে তাকায়।

: দেখলাম তো খবরের কাগজ পড়লে—প্রাণেশ্বরের সব খবর জেনে নিলে। দেখতে যাবার জন্য তাগিদ দিতে হবে কেন?

প্রাণেশ গুলি খেয়ে হাসপাতালে গেছে, এ খবরটা প্রথম পাতায় ছাপিয়েছে। তুমি পড়নি? প্রাণেশকে দেখতে যেতে তোমার ইচ্ছা হয় না?

মণিমালা কয়েক মুহূর্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর বলে, এত সকালে কি হাসপাতালে ঢুকতে দেয়? এটুকু জ্ঞানও তোর জন্মায় নি? হাসপাতালের গেটে হাঙ্গামা করতে যাচ্ছিস্?

ইন্দ্রাণী স্তব্ধ হয়ে থাকে।

হঠাৎ সে উপুড় হয়ে পড়ে মণিমালার পায়ে।

: আমি বোকা বনে গেছি মা।

মণিমালা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

: বোকা বনবি কেন? তোরাই তো চালিয়ে যাচ্ছিস জগৎ-সংসার। ভুল করে বসলে কী আর করা যায়, মানতে হবে যে ভুল হয়েছে। তাতে কিছু আসে যায় না।

: জগৎ-সংসার মানবে এ কথা?

: মানবে। না মানলে নিজেরাই মরবে। নতুন জগৎ-সংসার সৃষ্টি হবে। মনব না বললেই কি চলে?

তাদের এসব কথাবার্তা চলার মধ্যেই চপল এসেছিল। কিন্তু সে মুখ খোলে নি—একটি কথা বলে নি। সেটা বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল ইন্দ্রানীর।

মণিমালার সঙ্গে তর্কবিতর্ক শেষ হবার পর, মণিমালা তাদের জন্য চা তৈরী করতে যাবার পর ইন্দ্রাণী চপলকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি যে এমন চুপচাপ আজ?

চপল বলে, কিচ্ছু বলার নেই তাই চুপচাপ, গলা সাধা শুনছিলাম।

: তোমার কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবার ঝোঁক চেপেছে?

: এটা মনে হল কেন?

: দিন দিন সব ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যাচ্ছ।

চপল হেসে বলে, মোটেই বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা। এটা উদাসীনতা নয়। ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপার তুচ্ছ করতে শিখেছি, বাতিল করতে শিখেছি।

: তাই নাকি!

: তাই। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিব্রত হয়ে থাকলে বড় ব্যাপারে আসল ব্যাপারে মাথা গুলিয়ে যায়।

: কি করে ঠিক কর কোনটা তুচ্ছ ব্যাপার কোনটা বড় ব্যাপার? আসল ব্যাপার?

: নিজের হিসাব দিয়ে ঠিক করি। কি করা আমার বেশী দরকার কি করা কম দরকার সেই হিসাবে ঠিক করি।

: দশজনের কথা ভাবো না ?

: আমার যেটুকু ভাবা দরকার সেইটুকু ভাবি।

এসব কথাবার্তা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেবার মত নয়। একজন তেজী প্রাণবন্ত যোয়ান ছেলেরই চিন্তাধারা তো।

কাজও সে করে প্রাণ দিয়ে।

দেহ পাত করে খাটে।

সে কেন এ-ভাবে চিন্তা করে আর কথা বলে সেটা বুঝবার চেষ্টা না করলে চলবে কেন !

কিন্তু বুঝবে কে ?

গরজ কার ?

প্রাণেশ্বর সকালে কিছু খায় নি।

শরীরটা খুব খারাপ ছিল।

শরীরটা আরও খারাপ হয়ে গেল সন্ধ্যার দিকে।

ডাক্তার ডাকতে হল।

ডাকার দত্ত একটা ইনজেকশন দিল।

নিজে বসে থেকে তাকে দুধ বার্লি খাওয়ালো।

বললো : একটু সাবধানে থাকতে হবে। খাওয়াদাওয়া সব বিষয়ে। নার্ভাস সিস্টেমে কি যে একটা ব্যাপার শুরু হয়েছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না।

: নার্ভাস সিস্টেম ?

: নার্ভাস সিস্টেম।

: আমি ভেবেছিলাম পেটের গোলমাল হয়েছে।

: পেটের গোলমাল হয়েছে কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। নার্ভাস সিস্টেমের গোলমাল থেকে পেটের গোলমাল হয়েছে—আসল হল নার্ভাস সিস্টেম।

আসল হল নার্ভাস সিস্টেম।

সে তো জানা কথাই।

দেহটা বজায় রেখে কাজকর্ম সব কিছু চালিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে স্নায়ুমণ্ডলী প্রধান। একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ডাক্তার দত্ত যে তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়েছিল তার মানে কি আর বোঝে না প্রাণেশ্বর।

সাড়া জাগে কি না।

পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলে স্নায়ুমণ্ডলীতে সাড়া জাগে কিনা।

দেহগত সাড়া।

মনোগত নয়।

সেদিন একটা কাণ্ড হয় বাড়িতে।

চপল আর মৃদুলার কাণ্ড।

দু-জনে যথাসাধ্য সাধারণ বেশ ধরার চেষ্টা করেছে বুঝতে পারা যায়—কিন্তু দু-জনেরই সাজপোশাকে যেন জাঁকজমকের ভাবটা বেশ স্পষ্ট হয়ে থাকে।

সেটা অবশ্য শুধু লক্ষণ।

যে কাণ্ড তারা করেছে তারই লক্ষণ।

মৃদুলা সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে।

কপালে সিঁদুরের মস্ত একটা ফোঁটা আঁটতেও কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নি।

মণিমালাকে তারা প্রণাম করে।

ইন্দ্রাণী মুচকে হাসে।

বলে, বেশ বেশ, শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা তাহলে হল! তা আমাদের একটা খবর দিলে আমরা গিয়ে কি হাঙ্গামা করতাম? বড়-জোর বলতাম যে লুচি সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াও।

মৃদুলা মণিমালাকে বলে, কতগুলো ঝনঝাট ছিল, হঠাৎ এভাবে ব্যাপারটা না সেরে উপায় ছিল না।

মণিমালা বলে, বেশ করেছিস। ঝনঝাট মিটে গেছে তো?

মৃদুলা বলে, মনে তো হয় মিটে গেছে, তারপর দেখা যাক।

ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে হেসে বলে, শুধু লুচি সন্দেশ রসগোল্লা দিলেই তুই খুশী হবি ?

ইন্দ্রাণী বলে, খুশী হবার ব্যাপার তো নয়। ভোজ একটা দিতেই হবে—চুপিচুপি বিয়ে চুকিয়ে আসাটা কেউ মানবে না। আমি বুঝতেই পারছি না ব্যাপারটা।

মণিমালা বলে, তুই চুপ কর। তুই কোনদিন কিছু বুঝতে পারবি না।

চপল এবার মুখ খোলে।

সে বলে, ওর কথাটা তুমি বুঝতে পার নি মণিমা। ওসব টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে ইন্দ্রাণী মাথা ঘামাচ্ছে না। ও বলছে কি—আমাদের এত ভাব হয়েছিল, হঠাৎ এরকম ভাবে কাউকে না জানিয়ে বিয়ে সারতে হল—এসব আগে জানা যায় নি কেন।

ইন্দ্রাণী বলে, সত্যিই তো। আমাদের জানালেই আমরা ব্যবস্থা করে দিতাম।

মৃদুলা হাসে না।

গম্ভীর মুখে বলে, তোরা ব্যবস্থা করতে পারবি জানলে কি আমরা এত হাঙ্গামা করতাম ?

: কেন ব্যবস্থা করতে পারতাম না ?

: দু-তিন দিনের মধ্যে ওরকম বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় না। বুড়োদের সলাপরামর্শের জন্য ঘোঁট পাকাতে দিতে হবে, আত্মীয়বন্ধুকে চিঠি লেখালেখি করতে দিতে হবে—তারপর হাজার রকম খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করতে হবে, টাকা পয়সার হিসেব কষতে হবে—হাজার রকম ঝন্‌ঝাট।

: ঝন্‌ঝাট অন্যেরা করত।

মৃদুলা মৃদুস্বরে বলে, তা করত—সেজন্য নয়। সময় লাগত অনেক।

ইন্দ্রাণী খোঁচা দিয়ে বলে, কত আর সময় লাগত ? বড়-জোর একমাস ? একটা মাস ধৈর্য ধরতে পারলে না তোমরা ?

মৃদুলার মুখে সিঁদুরের আভা দেখা দেয়, সে কিছু বলে না।

চপলও চুপ করে থাকে।

মণিমালা ইন্দ্রাণীকে বলে, তুই আর কিছু বলিস নে, চুপ করে থাক।

তখন মৃদুলা বলে, কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। দুজনেই আমরা একটু দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। পরামর্শ দিল প্রাণেশ্বর।

মণিমালা বলে, প্রাণেশ কিছুই বলে নি আমাদের।

ইন্দ্রাণী বলে, প্রাণেশদা যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

মণিমালা বলে, বোকা মেয়ে, চুপ করে থাক। কাউকে কিছু না বলাই উচিত হয়েছে প্রাণেশের। একটা দায় পরামর্শ দিয়েছে, ব্যবস্থা করেছে, দশজনকে বলে বেড়ালেই ছ্যাবলামি করা হত।

মণিমালা তাদের জন্ম খাবার আনায়। নিজে গিয়ে মোড়ের দোকান থেকে মৃদুলার জন্ম দামী একটা শাড়ি কিনে আনে।

বলে, সোনার জিনিস পাওনা রইল। দু-চার দিনের মধ্যে পাবি।

মৃদুলা কেঁদে ফেলতে মণিমালা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ইন্দ্রাণী বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকে।

ইন্দ্রাণীর মনে অনেক কৌতূহল ছিল, জিজ্ঞাসায় ফেটে পড়ছিল তার মন। কিন্তু আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়ে সেদিন সে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করে না।

মণিমালাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়। প্রায় মিনতি করে বলে, বৌ-ভাতের একটা ভোজ দাও না মা? যে ভাবেই বিয়ে হয়ে থাক তা দিয়ে আমাদের দরকার কি? বিয়ে যখন হয়েছে, বৌ-ভাত করাটা উচিত নয়?

মণিমালা সহজ সুরে বলে, তোর বলার আগেই আমি তা ভেবেছি। মুশকিল হল তোর বাবাকে নিয়ে। চপলকে বাড়িতে দেখলেই রাগারাগি করবে। সে কথাটাই আমি ভাবছিলাম।

ইন্দ্রাণী বলে, বাবাকে আমি সামলে দেব।

: পারবি?

: পারব। বাবার কাছে কোন আব্দার করি না। এই একটা আব্দার যদি না রাখে—সম্পর্ক চুকিয়ে দেব।

মণিমালা একটু হাসে।

: সম্পর্ক চুকিয়ে দিবি? বাবার পয়সায় খাচ্ছিস পড়ছিস—বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিস, লেখাপড়া চালাচ্ছিস এসব মনে আছে তো? বাবা মাইনের টাকা না দিলে তোর নাম কাটা যাবে।

: আমার সব খেয়াল আছে। বাবার জন্য তুমি ভেবো না।

সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে সমর শুধু এক কাপ চা খায়। বলে সে বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক কিছু খেয়েছে—রাত্রে বাড়িতে রান্না তরকারী মাছ ভাত খাবে কিনা সেটাও সংশয়ের ব্যাপার।

তখন ইন্দ্রাণী তার কাছে যায়।

মণিমালা আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শোনে।

ইন্দ্রাণী বলে, তুমি না খেয়ে মরবে, আমি তা সইব না বাবা। ফুলকো লুচি ভেজে আনছি, আলু ভাজা বেগুন ভাজা পটোল ভাজা আনছি, তোমাকে খেতে হবে।

সমর উঠে বসে। মেয়ে এত বড় হয়ে গেছে সেটা যেন আজ তার প্রথম খেয়াল হয়।

সে মৃদুস্বরে বলে, খেয়ে আমার যদি ভীষণ কষ্ট হয়, সেটা দেখবে কে?

একটু চুপ করে থেকে ইন্দ্রাণী বলে, কষ্ট তোমার হবে না। কষ্ট যদি হয়, আমি দেখব। আমি যদি না পারি, ডাক্তার ডেকে আনব।

সমর হাঁ করে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না এই মেয়েটা তারই মেয়ে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে কয়েক রকম ভাজা আর আলু পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধা বড় ট্যাংরা মাছের ঝোল দিয়ে ইন্দ্রাণী সমরকে টাটকা-ভাজা ফুলকো লুচি খাওয়াতে বসায়।

সমর খায়। ভাল ভাবেই খায়।

পরম আরামে সে যখন খেয়ে ওঠে ইন্দ্রাণী তখন বলে, মৃদুলার সঙ্গে চপলমামার আদালতের বিয়ে হয়েছে জান তো?

সমর বলে, শুনেছি।

ইন্দ্রাণী আব্দারের সুরে বলে, বিয়ে যখন হয়েই গেল, এসো আমরা সেটা মেনে নিই বাবা। বৌ-ভাতের ভোজ দাও না একটা—সবাইকে ডেকে? তুমি রাজী না হলে তো হবে না, লক্ষ্মী বাবা রাজী হও।

খেতে খেতে সমর আবার বিস্ময়ের সঙ্গে মেয়ের মুখের দিকে তাকায়।

ইন্দ্রাণী হাসিমুখে বলে, আমার এ আব্দারটা রাখতে হবে বাবা।

: আমি হাঙ্গামা করতে পারব না।

: তোমার কিছুই করতে হবে না। সব হাঙ্গামা আমরা করব। তুমি শুধু রাজী হও—সায় দাও। বাস্, আর কিছু চাই না।

সমর এবার হেসে বলে, তুই তো বড় পাজী হয়ে উঠেছিস দানি।

ইন্দ্রাণীও হেসে বলে, পাজী বলছ কেন? বল যে চালাক-চতুর হয়েছি! তুমি কি চাও না আমি চালাক চতুর হই?

সমর জিজ্ঞাসা করে, কত টাকা খরচ করতে হবে আমায়?

ইন্দ্রাণী সঙ্গে সঙ্গে বলে, বেশী না, শ-খানেক। মৃদুলাকে একটা শাড়ি দেব, মোটামুটি রকমের। পঁচিশ ত্রিশ জনকে খাওয়াবো। বাস্, চুকে গেল।

সমর গম্ভীর হয়ে বলে, একশো টাকার এক পয়সা বেশী কিন্তু আমি দেব না।

ইন্দ্রাণীও গম্ভীর হয়ে বলে, তা বললে কি হয়? দশ বিশ টাকা বেশীও লাগতে পারে। নিজের শালার বিয়ের বৌ-ভাত দিচ্ছ—খুঁত হলে দশজনে তোমারি নিন্দে করবে।

সমর বলে, বুঝেছি, আর বেশী চালাকি করিস না। পঁচিশ ত্রিশ টাকার মধ্যে একটা কিছু সোনার জিনিস আনিস তো পছন্দ করে। বৌ-ভাত দিলেই তো হবে না—একটা কিছু প্রেজেণ্ট তো দিতে হবে আমাকেও।

ইন্দ্রাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তুমি সত্যি খুব ভালো বাবা।

মণিমালা তখন ঘরে ঢোকে।

বলে, এই যে খরচের দায় নিলে, চাদ্দিকে তোমার দেনা-পাওনা কত আছে খেয়াল রেখেছ তো?

: দু-মাস পিছিয়ে দেব।

: বাড়িতে এসে রোজ গালাগালি দিয়ে যাবে।

: গালাগালি যদি দিয়ে যায় আমায় দিয়ে যাবে, তোমায় তো দেবে না। তুমি কেন এত অস্থির হচ্ছ?

মণিমালা যে কী ভীষণ রেগে গেছে সেটা তার মুখ দেখেই টের পাওয়া যায়।

কথা কিন্তু সে বলে শান্ত সুরে।

: তোমায় অপমান করলে আমার গায়ে বাজবে না?

সমর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তারপর বলে, সে কথা বলছি না। আমি বলছি কি যে আমার বিচার-বিবেচনা হিসাব-নিকাশ নেই ভেবেছ? আমি বৌভাতের ব্যাপারটাও চালিয়ে দেব—দেনাগুলোও মিটিয়ে দেব।

: তারপর?

: বাড়তি খেটে আপিসের ধার শোধ করব।

এমনিভাবে সাধ আহ্লাদ মানুষকে কাবু করে।

বাড়তি খেটে আপিসের দেনা শোধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে সমর বিছানা নেয়।

সেটা পরের কথা।

সমারোহ করেই বৌ-ভাতের ভোজটা দেওয়া হয়।

শোয়ার ব্যবস্থা করার সমস্যাটা ছিল কঠিন। একটা ঘরে অনেকের গাদাগাদি করে শোয়ার ব্যবস্থা করে মণিমালাকে সম্ভব করতে হয়েছিল নব দম্পতীর জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করা।

চপল শুয়ে পড়েছিল।

মৃদুলাকে ঘরে যাবার জন্য তাগিদ দেওয়া হচ্ছিল বারংবার।

মৃদুলার যেন কোন তাগিদ নেই।

: তোমরা শোও—আমিও শোব। ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

ইন্দ্রাণী তার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে খোলা ছাতে নিয়ে যায়।

বলে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো।

: সস্তা চালাকি করো না আমার সঙ্গে। আমি সব জানি। আমি জানি যে তুমিও জানতে মামার ওই রোগটা হয়েছে। তবু তুমি রাজী হলে? যে মরবে জানা কথা তার দায়টা ঘাড়ে নিলে?

মৃদুলা মৃদুস্বরে বলে, মরবে কেন? বাঁচাবার জন্যই দায়টা ঘাড়ে নিয়েছি।

: তার মানে?

: মানে খুব সোজা। তোর বাবা তো তাড়িয়ে দিল। মেসে হোটেলে থেকে কি এ রোগ সারানো যায়? আমি তাই চটপট বিয়ের ব্যবস্থাটা সেরে ফেললাম। বাড়িতে যত অঘটন ঘটুক জামাইকে তো আর ফেলতে পারবে না।

ইন্দ্রাণী বড় বড় চোখ করে তাকায়।

: জেনেশুনে তুমি এই রোগীর দায় ঘাড়ে নিলে?

মৃদুলা হেসে বলে, জেনেশুনেই নিলাম। আর কেউ তো নেবে না, অগত্যা আমাকেই দায় নিতে হবে। মরতে দিলে চলবে না তো, যেভাবে হোক ওকে বাঁচাতে হবে?

: পারবে?

: কি জানি। চেষ্টা করে দেখি।

ইন্দ্রাণী আঁচল নাড়াচাড়া করতে করতে নতমুখে বলে, আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। সত্যি আজ লজ্জা পেলাম।

মৃদুলা তার থুতনি ধরে মুখ উঁচু করে জিজ্ঞাসা করে, অন্যরকম কি ভেবেছিলি?

: অন্য দশজনে এ রকম ব্যাপারে যা ভাবে।

: আমার ছেলেপুলে হবে, তাই জোড়াতালি দিয়ে তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম?

: সবাই তাই বলছে।

মৃদুলা তার থুতনি ছেড়ে দেয়, নিজে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে।

বলে, আমার কোনদিন ছেলেপুলে হবে না।

ইন্দ্রাণী যেন চমকে যায়।

: কি করে জানলে ?

: জানি। অনেকদিন থেকেই জানি।

ইন্দ্রাণী খানিক চুপ করে থেকে বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ? তুমি হয় তো রেগে যাবে।

মৃদুলা বলে, তোর যা খুশি জিজ্ঞাসা কর—আমি কিছুতেই রাগব না।

ইন্দ্রাণী অন্যদিকে চেয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, চপল-মামা জানে তোমার এই ব্যাপার ?

মৃদুলা সশব্দে হেসে ওঠে।

: জানে বই কি। প্রথম থেকে জানে।

প্রাণেশ্বরের মন-মেজাজ বিশ্রীরকম বিগড়ে গিয়েছিল।

আত্মীয় বন্ধু বলতে শুরু করেছিল, প্রাণেশ্বরের মাথাটা এবার খারাপ হয়ে যাবে।

প্রাণেশ্বর ভোর-বেলা বেরিয়ে যায়, আর দশটা এগারোটায় ঘরে ফেরে।

ঘরেই ফেরে।

কারো সঙ্গে কথা কয় না। কোন আরাম বিলাসের দাবি জানায় না, কলঘরে গিয়ে স্নান করে এসে কোণাচে ঘরটার কোণাতে যদি ভাত মাছ ডাল ডিম তরকারি ভাজি ইত্যাদি কোনটা কোনদিন কমবেশী করে দেওয়া হয়ে থাকে—তবু সে আপত্তি করে না—খেয়ে যায়।

ধীরে সুস্থে খেয়ে যায়।

তখন হয় তো শোনা যায় বৈদ্যুতিক বিশেষ ষ্টোভে চাপানো গাছ-তোলানো ঘি-জাতীয় পদার্থের ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ—

পরোটা বেলা নিয়ে সুবর্ণের সঙ্গে সরলার দু'-চার মিনিট কথা কাটাকাটি হয়।

সুবর্ণ বলে, এত বেশী আদর দিয়ে ছেলেকে গোল্লায় দিচ্ছ!

: গোল্লায় দিচ্ছি?

: দিচ্ছ বইকি, এত বেশী আল্‌গা আদর যোয়ান মানুষের সয়? অগত্যা বাইরে গোল্লায় যায়।

: বকিস্‌নে বেশী তুই। যেমন খেতে চায় আমি ঠিক সেরকম ব্যবস্থা করি।

: ছাই কর!

: দেখবি আয় আমার সঙ্গে—কী খেয়েছে কী না খেয়েছে।

প্রাণেশ্বর নিজের ঘরে টিপয়-জাতীয় ছোট টেবিলে চা-টোস্ট মাত-ভাত রুটি-মাংস সব কিছু খাবার আব্দার ধরেছিল।

সরলা রাজী হয় নি।

চা রুটি দেওয়া যায়।

কিন্তু ভাত মাছ মাংস দেওয়া যায় না।

রান্না ঘরের রোয়াকেই পিঁড়ি কিম্বা আসন বসতে পেতে হবে, তারপরে আর কোন কথা নেই।

পিঁড়ি ধোয়া যায়।

আসন করা খবরের কাগজ ফেলে দেওয়া যায়—কিন্তু ছেলে নিজের পয়সার নিজের সুবিধার জন্ত টাকা দিয়ে টিপয় কিনেছে বলেই সেই টেবিলে কি আমিষ রান্না দেওয়া যায়!

রান্না ঘরের সামনের রোয়াকে ফুল-বোনা পশমের আসনে বসে সে খাক না মাছ মাংস, ডিম—সরলা তো রেঁধে-বেড়ে সাজিয়েই রেখেছে!

দেখা যায়, রান্না ঘরের সামনের সরু রোয়াকে ফুল-তোলা পশমের আসনের সামনে সেকালের প্রকাণ্ড একটা প্রসাদ বিতরণের থালায় হরেক রকম প্রসাদের সমাবেশ দেখা যায়।

প্রাণেশ্বর রাগে আগুন হয়ে গর্জন করে বলে, তোমারা কি আমাকে খাইয়ে মারতে চাও?

মণিমালা এগিয়ে আসে।

প্রাণেশ্বরের টানেই বোধ হয় সে এসেছিল। নইলে আজ তার এখানে আসবার কোনই কারণ ছিল না।

মণিমালা বলে, মায়েরা কি ছেলেমেয়েদের মারতে চায়রে প্রাণেশ? এই শিক্ষা তুই পেয়েছিস এত লেখা পড়া শিখে এত কাণ্ড করে?

: কি বলছ মণি-মা?

: আর পাগলামি করিস না।

: পাগলামি করছি?

: করছিস বইকি। নিময় ধরে পাগলামি করছিস বলে লোকে অতটা সহ্য করছে।

থালার খাবার সাজানো।

ফুল তোলা আসনের কোণে তীব্র-গন্ধী ধূপকাটি জ্বালানো।

প্রাণেশ্বর বলে, আমি খেয়ে এসেছি। বন্ধুরা কতরকম খাবার এনে খাওয়ালে, সুক্ত থেকে শুরু করে মাছ-মাংস সব কিছু। তোমরা ভারি একবকম দামী মাছ রেঁধেছ—ওরা আমার তিনরকম মাছ খাইয়েছে। তরিতরকারী সুক্তানি কতরকমের যে খাইয়েছে—বললে তোমাদের গোসা হবে। ওরকম তোমরা রাঁধতে পার না?

: কেন রাঁধতে পারি না?

: ভদ্র ঘরের মেয়ে—জানবে শিখবে কোত্থেকে।

মণিমালা হাসি মুখেই বলে, ভদ্র ঘরের মেয়েদের তুই বড় বেশী অবজ্ঞা করিস!

প্রাণেশ্বরও হেসে বলে, মোটেই না। আমার মা-বোনদের উড়িয়ে দিও না মণিমা তাদের জন্য কত করেছি তাও উড়িয়ে দিও না।

কথাটা মনে লাগে।

মনে হয় যে প্রাণেশ্বর আরও যদি কথা বলে তাও মনে লাগাতে তারা প্রস্তুত আছে।